# লাল-সবুজে দাগানো

# TEXT BOOK

# উদ্ভিদবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

# চতুর্থ অধ্যায়

# অণুজীব

## MICRO-ORGANISM / MICROBE

প্রধান শব্দসমূহ : ভাইরাস, $T_2$ ফায, ব্যাকটেরিয়া, কক্কাস, দ্বি-ভাজন, মেরোজাইগোট

যে সব জীব খুবই ক্ষুদ্রাকায় এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায় না তাদেরকে অণুজীব (Microbes) বলা হয়। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, সে শাখাকে অণুজীবতত্ত্ব বা মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology) বলা হয়। ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত। অণুজীববিদগণ ভাইরাসকেও অণুজীব বলতে চান। মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছ। এ অধ্যায়ে তোমরা অতি-আণুবীক্ষণিক ভাইরাস এবং আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
২. ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবন চক্র বর্ণনা করতে পারবে।
৩. ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারবে।
৫. ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
৬. ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৭. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে।
৮. ব্যবহারিক
১০ ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
৯. *Plasmodium vivax* (ম্যালেরিয়ার পরজীবী) এর জীবন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
১০. মানবদেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর সংক্রমণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

### ভাইরাস (Virus)

সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জলাতঙ্ক, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বার্ড ফ্লু, ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের কথা প্রায়ই শুনে থাকি; কখনো নিজেরাই আক্রান্ত হই। এগুলো সবই ভাইরাসঘটিত রোগ অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা এ রোগগুলো হয়ে থাকে। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুর (গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, ইঁদুর, মুরগি), এমনকি গাছপালারও ভাইরাসঘটিত রোগ হয়। তাহলে ভাইরাস কী? ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী বস্তু। ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হলো বিষ। ভাইরাস আকারে এতোই ছোট যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না। তাই ভাইরাসকে বলা হয় অতি-আণুবীক্ষণিক (ultra-microscopic); অর্থাৎ ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু। ভাইরাসের দেহ বাইরের প্রোটিন আবরণ এবং অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) এই দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। কাজেই ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক সত্তা। ভাইরাস জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় অংশ) ও প্রোটিন (আবরণ) দিয়ে গঠিত অকোষীয়, অতি-আণুবীক্ষণিক সত্তা, বাধ্যতামূলক পরজীবী জৈবকণা যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে।

ভাইরাসকে জীবাণু (বা অণুজীব) না বলে 'সত্তা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো কেন? কারণ, আমরা জানি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত, কিন্তু ভাইরাস অকোষীয়। তাছাড়া এরা জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারলেও জীবদেহের বাইরে একেবারেই নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে। সত্যিকার অর্থে এরা অণুজীব নয়, অণুজীবের মতো। ভাইরাস দেহে কোষীয় বৈশিষ্ট্য তথা কোষ প্রাচীর, কোষঝিল্লি ও সাইটোপ্লাজম নেই, তাই ভাইরাসকে অকোষীয় বলা হয়।

**আবিষ্কার :** গুটিবসন্ত, পীত জ্বর ইত্যাদি ভাইরাসঘটিত রোগ পৃথিবীতে বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু ভাইরাস সম্বন্ধে কোনো ধারণাই মানুষের ছিল না। বিজ্ঞানী **Edward Jenner** (এডওয়ার্ড জেনার) ১৭৯৬ সালে প্রথম ভাইরাসঘটিত বসন্ত রোগের কথা উল্লেখ করেন। এরপর সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস হলো টোবাকো মোজাইক ভাইরাস অর্থাৎ TMV. হল্যান্ডের বিজ্ঞানী **Adolf Mayer** ১৮৮৬ সালে তামাক গাছের পাতার ছোপ ছোপ দাগবিশিষ্ট রোগকে টোবাকো মোজাইক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে ১৮৯২ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী **Dmitri Ivanovsky** (দিমিত্রি আইভানোভসকি) প্রমাণ করেন যে, রোগাক্রান্ত তামাক পাতার রস ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টার দিয়ে ফিল্টার করার পরও সুস্থ তামাক গাছে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই তিনি বলেন যে, তামাক গাছের মোজাইক রোগজীবাণু ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষুদ্র এবং এই রোগ-বিষকে ভাইরাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন কিন্তু কোনো ভাইরাস শনাক্ত করতে পারেননি। **তবুও তাঁকেই ভাইরাসের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।** তারও পরে ১৮৯৮ সালে আরেক হল্যান্ড বিজ্ঞানী **Martinus Beijerinck** (মার্টিনাস বিজারিঙ্ক) তামাকের মোজাইক রোগের ভাইরাসকে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV হিসেবে উল্লেখ করেন। **Walter Reed** (ওয়াল্টার রিড) ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম মানবদেহের পীত জ্বর (yellow fever) সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **Wendel Meredith Stanley TMV** কে পৃথক করে কেলাসিত করেন, যে কারণে তিনি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। **Stanley** মোজাইক আক্রান্ত ১ টন তামাক পাতা থেকে মাত্র এক চামুচ পরিমাণ ভাইরাস কৃস্টাল সংগ্রহ করেন। ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের দুজন বিজ্ঞানী **F. C. Bawden** (ব্যাডেন) এবং **N. W. Pirie** (পিরি) বলেন যে, TMV নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ১৯৫১ সালে **R. S. Shafferman** (শেফারম্যান) এবং **M. E. Morris** (মরিস) নীলাভ-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ধ্বংসকারী ভাইরাস সায়ানোফায আবিষ্কার করেন। ভাইরাস জড় না জীব এর সঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। কারণ ভাইরাসের দেহে জড় ও জীব উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভাইরাসের দেহে জড় ও জীবের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী **A. M. Lwoff ১৯৫২ সালে ভাইরাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন, ভাইরাস ভাইরাসই। এটি জীবীয় বস্তুও নয় আবার জড় রাসায়নিক বস্তুও নয়। জীবীয় ও জড় বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি কিছু।** ১৯৮৪ সালে **Gallow** (গ্যালো) মানুষের মরণব্যাধি এইডস রোগের ভাইরাস HIV আবিষ্কার করেন। ১৯৮৯ সালে **Hervey J. Alter** (হারভে জে. অল্টার) মানুষের নীরব ঘাতকব্যাধি হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। **F. C. Bawden এবং N. W. Pirie ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন।** এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ ধরনের ভাইরাসের বর্ণনা করা হয়েছে।

**আবাসস্থল :** উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি প্রায় সব জড় মাধ্যমে ভাইরাস অবস্থান করে। কাজেই বলা যায়, **জীব ও জড় পরিবেশ উভয়ই ভাইরাসের আবাস।** পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ১ চামচ সমুদ্রের পানিতে ১ মিলিয়ন ভাইরাস থাকে। **ভাইরোলজি (Virology)** বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে ভাইরাসের আকার, গঠন, বংশবিস্তার, রোগতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। **W. M. Stanley-কে ভাইরোলজির জনক বলা হয়ে থাকে।**

**আয়তন (Size) :** ভাইরাস অতি-আণুবীক্ষণিক এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে দেখা যায় না। ভাইরাসের গড় ব্যাস ৪–300 nm (ন্যানোমিটার)। **ভাইরাস সাধারণত ১২ nm (যেমন- পোলিও ভাইরাস) হতে ৩০০ nm (যেমন-তামাকের মোজাইক ভাইরাস) পর্যন্ত হয়ে থাকে।** গবাদী পশুর ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র (৮-১২ nm)। ভ্যাকসিনিয়া ও ভেরিওলা ভাইরাস (২৮০–৩০০ nm)। গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস, গো-বসন্তের ভাইরাস আরও বৃহদাকৃতির হয়।

**আকৃতি (Shape) :** ভাইরাস সাধারণত নিম্নলিখিত আকৃতির হয়ে থাকে। দণ্ডাকার, বর্তুলাকার, ব্যাঙাচি আকার, সূত্রাকার (সিলিন্ড্রিক্যাল), গোলাকার, ডিম্বাকার, পাউরুটি আকার, বহুভুজাকৃতি প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট।

---

১ মিটার (m) = ১০০০ মিলিমিটার (mm)
১ মিলিমিটার (mm) = ১০০০ মাইক্রোমিটার (μm) বা মাইক্রন
১ মাইক্রোমিটার (μm) = ১০০০ ন্যানোমিটার (nm) বা মিলিমাইক্রন (mμ)
১ মাইক্রোমিটার (μm) = ১ মাইক্রন (μ)
১ ন্যানোমিটার (nm) = ১ মিলিমাইক্রন (mμ)

চিত্র ৪.১ : বিভিন্ন আকৃতির ভাইরাস।

**ভাইরাসের প্রকৃতি (Nature of virus) :** ভাইরাসের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো দ্বিধাবিভক্ত। বিজ্ঞানী Lwoff ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন- ভাইরাস জীবও নয়, জড়বস্তুও নয়; ভাইরাস ভাইরাসই। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়- ভাইরাস সজীব ও জড়বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি সত্ত্বা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী Stanley ও Valens বলেন- ভাইরাস এমনিতেই জড়বস্তুর ন্যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ভাইরাস কোনো সজীব কোষকে আক্রমণ করার সুযোগ পায় সে মুহূর্তে এতে প্রাণের সঞ্চার হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী Salle বলেন–ভাইরাস রাসায়নিক অণু ও সজীব কোষের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক প্রকার বস্তু।

**ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of virus) :** ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) জীবীয় বৈশিষ্ট্য।

**(ক) ভাইরাসের জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য**

১। ভাইরাস অকোষীয় ও অতি আণুবীক্ষণিক। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লি, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এসব নেই।

২। এদের নিজস্ব কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই এবং খাদ্য গ্রহণ করে না ফলে পুষ্টি ক্রিয়াও নেই।

৩। ভাইরাস জীবকোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।

৪। ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টারে ভাইরাস ফিল্টারযোগ্য নয়।

৫। ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায়, তলানিকরণ করা যায়।

৬। জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার মতো নিষ্ক্রিয়।

৭। ভাইরাসের দৈহিক বৃদ্ধি নেই এবং পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না।

৮। ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমাহার মাত্র।

৯। ভাইরাস অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ প্রতিরোধে সক্ষম এবং আন্টিবায়োটিক এদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

**(খ) ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য**

১। পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি (multiplication) করতে পারে।

২। নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মাতৃ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস জন্ম দিতে পারে।

৩। ভাইরাসের দেহ জেনেটিক বস্তু DNA বা RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

৪। ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।

৫। ভাইরাস পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে এবং প্রকরণ (variation) তৈরি করতে সক্ষম।

৬। এদের অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।

৭। এদের জিনগত পুনর্বিন্যাস (genetic recombination) ঘটতে দেখা যায়।

প্রাণ-রসায়নবিদগণ ভাইরাসের জড়-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন, আর অণুজীব বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসের জীব-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। এজন্য ভাইরাসকে জীব ও জড়ের সেতুবন্ধন বলে।

**ভাইরাসের গঠন (Structure of virus) :** ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্যকে ভৌত ও রাসায়নিক গঠন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে।

**ভাইরাসের ভৌত গঠন :** ভাইরাসের ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

১। কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বস্তু তথা নিউক্লিক অ্যাসিড যা DNA অথবা RNA দিয়ে গঠিত (একসাথে উভয়টি নয়)।

২। কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড তথা প্রোটিন আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণুর বিন্যাসই ভাইরাসের আকার-আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন অণু সজ্জিত হয়ে দণ্ডাকৃতির হেলিক্স এবং গোলাকৃতির পলিহেড্রন কাঠামো গঠন করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাবইউনিট নিয়ে গঠিত। সাবইউনিটকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার (capsomere)। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও ধরন বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্যাপসিডের বহিস্থ আবরণ মসৃণ, কখনো কন্টকিতও হতে পারে।

৩। কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে অপর একটি আবরণ থাকে।

**ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন :** রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু দিয়ে গঠিত, যথা : নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং প্রোটিন (ক্যাপসিড)।

১। **নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) :** ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। নির্দিষ্ট ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA এর যে কোনো এক ধরনের হয়। কখনো একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে না। অন্যান্য জীবদেহে একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে। সাধারণত অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA এবং অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাসে DNA থাকে।

২। **প্রোটিন (ক্যাপসিড) :** প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষক দেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে। ক্ষেত্র বিশেষে ক্যাপসিডে প্রোটিনের সাথে লিপিড ও স্টার্চ থাকে। ক্যাপসিড ভেতরের বস্তুকে (DNA বা RNA) সুরক্ষা করে এবং এটি অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে। সর্দিজ্বরে এটি হাঁচির উদ্রেক করে।

৩। **বহিস্থ আবরণ :** কোনো কোনো ভাইরাসে (যেমন-ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, HIV ইত্যাদি) ক্যাপসিডের বাইরে জৈব পদার্থের একটি আবরণ থাকে। এটি রাসায়নিকভাবে সাধারণত লিপিড, লিপোপ্রোটিন, শর্করা বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। লিপিড বা লিপোপ্রোটিন স্তরের এককে পেপলোমিয়ার বলা হয়। লিপোপ্রোটিন আবরণবিশিষ্ট ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলা হয়।

**ভাইরাসের প্রকারভেদ :** গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। **আকৃতি অনুযায়ী :** আকৃতি অনুযায়ী ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(i) **দণ্ডাকার (Rod-shaped) :** এদের আকার অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস।

(ii) **গোলাকার (Spherical) :** এদের আকার অনেকটা গোলাকার। উদাহরণ– পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

(iii) **ঘনক্ষেত্রাকার/বহুভুজাকার (Cubical/Polygonal) :** এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন- হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস।

(iv) **ব্যাঙাচি আকার (Tadpole shaped) :** এরা মাথা ও লেজ– এ দুই অংশে বিভক্ত। উদাহরণ- $T_2$, $T_4$, $T_6$ ইত্যাদি।

(v) **সিলিন্ড্রিক্যাল/সূত্রাকার (Cylindrical/Thread shaped) :** এদের আকার লম্বা সিলিন্ডারের মতো। যেমন- Ebola virus ও মটরের স্ট্রিক ভাইরাস।

(vi) **ডিম্বাকার (Oval shaped) :** এরা অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

২। **নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী :** নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী ভাইরাস দু' প্রকার; যথা : (i) DNA ভাইরাস এবং (ii) RNA ভাইরাস।

(i) **DNA ভাইরাস :** যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA থাকে তাদেরকে **DNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ- $T_2$ ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridiscent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস। **Parvoviridae** গোত্রের ($\phi X_{174}$ ও $M_{13}$ কলিফায) ভাইরাসের **DNA** একসূত্রক।

(ii) **RNA ভাইরাস :** যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে RNA থাকে তাদেরকে **RNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ- TMV, HIV, ডেঙ্গু, পোলিও, মাম্পস, র‍্যাবিস ইত্যাদি ভাইরাস। **Reoviridae** গোত্রের (রিওভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস) ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।

৩। **বহিস্থ আবরণ অনুযায়ী** ভাইরাস দুই প্রকার; যথা : (i) বহিস্থ আবরণহীন ভাইরাস; যেমন– TMV, $T_2$ ভাইরাস; (ii) বহিস্থ আবরণী ভাইরাস; যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস, HIV ভাইরাস।

৪। পোষকদেহ অনুসারে ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে :

(i) **উদ্ভিদ ভাইরাস :** উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে উদ্ভিদ ভাইরাস বলে। যেমন– TMV, Bean Yellow Virus (BYV)। ব্যতিক্রম–ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস (DNA)।

(ii) **প্রাণী ভাইরাস :** প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে প্রাণী ভাইরাস বলে। যেমন–HIV, ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস।

(iii) **ব্যাকটেরিওফায বা ফায ভাইরাস :** ভাইরাস যখন ব্যাক্টেরিয়ার উপর পরজীবী হয় এবং ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে তখন তাকে ব্যাকটেরিওফায বলে। যেমন- $T_2$, $T_4$, $T_6$ ব্যাকটেরিওফায।

(iv) **সায়ানোফায :** সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ধ্বংসকারী ভাইরাসকে সায়ানোফায বলে। যেমন–$LPP_1$, $LPP_2$ (*Lyngbya, Plectonema* ও *Phormidium* নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার প্রথম অক্ষর দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে।)

৫। পোষক দেহে কীভাবে সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি করে তার উপর ভিত্তি করেও ভাগ করা হয়। যেমন-সাধারণ ভাইরাস ও রিট্রোভাইরাস। HIV একটি রিট্রোভাইরাস। এখানে ভাইরাল RNA থেকে DNA তৈরি হয়।

৬। **অন্যান্য ধরন :** যে সব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে থাকে তাদের মাইকোফায (Mycophage) বলে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে Holmes ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phaginae, উদ্ভিদ আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phytophaginae এবং প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাসকে Zoophaginae নামকরণ করেন।

**RNA ভাইরাস ও DNA ভাইরাস এর মধ্যে পার্থক্য**

| পার্থক্যের বিষয় | RNA ভাইরাস | DNA ভাইরাস |
|---|---|---|
| ১। আকৃতি | এরা সাধারণত দণ্ডাকার বা সূত্রাকার। | এরা সাধারণত গোলাকার, ব্যাঙ্গাচি আকার ও পাউরুটি আকৃতি। |
| ২। নিউক্লিক অ্যাসিড | এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর RNA | এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর DNA |
| ৩। আক্রান্ত জীব | অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাস ও সায়ানোফাযগুলো RNA ভাইরাস। | অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিও-ফাযগুলো DNA ভাইরাস। |
| ৪। সূত্রক | অধিকাংশ ভাইরাসের RNA একসূত্রক; ধানের বামন রোগ ও রিও ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক। | অধিকাংশ ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক; $\phi X_{174}$ ও $M_{13}$ কলিফায ভাইরাসের DNA একসূত্রক। |
| ৫। রোগ সৃষ্টি | অধিকাংশ RNA ভাইরাস উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে। | অধিকাংশ DNA ভাইরাস প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে। |
| ৬। এনভেলপ | সাধারণত এনভেলপ থাকে না। | ক্যাপসিডের বাইরে সাধারণত এনভেলপ থাকে। |
| ৭। উদাহরণ | টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, (TMV), পটেটো X ভাইরাস, শ্যুগারকেন মোজাইক, টারনিপ মোজাইক, আলফা-আলফা মোজাইক, রেবিস, মানুষের পোলিও, ডেঙ্গু, পীত জ্বর, মাম্পস, মিজ্‌লস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-B, এনসেফালারটিস ইত্যাদি ভাইরাস RNA ভাইরাস। | $T_2$ ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridescent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস DNA ভাইরাস। |

**ভাইরাসের পরজীবিতা (Parasitism of virus)** : পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকার চরিত্রকে পরজীবিতা বলে। ভাইরাস বাধ্যতামূলক পরজীবী (obligate parasite)। এটি একটি আদি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ভাইরাস তার বংশবৃদ্ধি তথা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যজীবের সজীব কোষের ওপর নির্ভরশীল। অন্য কোনো জীবের (মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি) সজীব কোষ ছাড়া কোনো ভাইরাসই জীবের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে না, বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কোনো আবাদ মাধ্যমে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করা বিজ্ঞানীদের পক্ষেও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

ভাইরাসের পরজীবিতা সাধারণত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রকারের ভাইরাস কোনো সুনির্দিষ্ট জীবদেহে পরজীবী হয়। যে সব ভাইরাস আদি কোষকে আক্রমণ করে, আর যে সব ভাইরাস প্রকৃত কোষকে আক্রমণ করে তারা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাইরাসের প্রোটিন আবরণটিই নির্ণয় করে তার আক্রমণের সুনির্দিষ্টতা (specificity)। পোষক কোষে কোনো ভাইরাস- প্রোটিনের জন্য রিসেপ্টর সাইট (receptor site) থাকলে তবেই ঐ ভাইরাস ঐ পোষক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে। এ জন্যই ঠাণ্ডা লাগার ভাইরাস (cold virus) শ্বাসতন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেন কোষকে আক্রমণ করতে পারে, চিকেন পক্স ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারে, পোলিও ভাইরাস উর্ধ্বতন শ্বাসনালী ও অন্ত্রের আবরণ কোষ, কখনো স্নায়ু কোষকে আক্রমণ করতে পারে। চিকেন পক্স ভাইরাস শ্বাসনালীকে আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ শ্বাসনালী কোষে এর জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই, ঠাণ্ডা লাগার ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ ত্বক কোষে এই ভাইরাসের জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই।

ফায ভাইরাস কেবল ব্যাকটেরিয়া কোষকেই আক্রমণ করে। ফায ভাইরাসের মধ্যে $T_2$-ব্যাকটেরিওফায *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রমণ করে। TMV ভাইরাস কেবল তামাক গাছকেই আক্রমণ করে। এমনই ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাইরাস সুনির্দিষ্ট প্রকার পোষক কোষকেই আক্রমণ করে থাকে।

**ইমার্জিং ভাইরাস (Emerging virus)** : ভাইরাসের পরজীবীতা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাস কখনো কখনো স্বাভাবিক পোষক প্রজাতি থেকে সম্পর্কহীন অন্য পোষক প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফ্লু (Flu) বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকৃত পোষক ছিল পাখি যা পরবর্তীতে সরাসরি মানুষে রোগ বিস্তার করে। ১৯১৮-১৯১৯ সালে পৃথিবীতে ২১ মিলিয়নের বেশি মানুষ এই ফ্লুতে মারা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা HIV-এর প্রকৃত পোষক বানর, যা পরে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। আদি পোষক থেকে পরে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টিকারী এসব ভাইরাসকে বলা হয় ইমার্জিং ভাইরাস (emerging virus); উদাহরণ– HIV, SARS, Nile virus, Ebola.

**ভিরিয়ন (Virion)** : নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিয়োক্যাপসিড। প্রতিটি ভিরিয়নে সর্বোচ্চ ২০০০ হতে ২১৩০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে।

**ভিরয়েডস (Viroids)** : ভিরয়েডস হলো সংক্রামক RNA। Theodore Diener (US এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট) এবং W. S. Rayner ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভিরয়েডস আবিষ্কার করেন। ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA অণু যা কয়েক শত নিউক্লিয়োটাইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহুগুণে ক্ষুদ্র। কেবলমাত্র উদ্ভিদেই ভিরয়েডস পাওয়া যায়। এরা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে এবং মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সন্তান সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ পোষকের এনজাইম ব্যবহার করে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানীগণ এখন ধারণা করছেন হেপাটাইটিস-ডি এর কারণ ভিরয়েডস। ভিরয়েড নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগ তৈরি করে।

**প্রিয়নস (Prions)** : সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হলো প্রিয়নস। এটি নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন প্রোটিন আবরণ মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের Kuru এবং Creutzfeldt রোগ; ভেড়া ও ছাগলের Scrapie রোগ প্রিয়নস দিয়ে হয়ে থাকে। বহুল আলোচিত 'ম্যাড কাউ' রোগ সৃষ্টির সাথে প্রিয়নস-এর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে প্রথম Stanley B. Prusiner অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির প্রিয়নস এর অস্তিত্বের কথা বলেন এবং ভেড়ার স্ক্র্যাপি (Scrapie) রোগে প্রথম পর্যবেক্ষণ (study) করা হয়। এজন্য তাকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

## ভাইরাসের গঠন

১। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV (Tobacco Mosaic Virus) : এটি দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। এটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় ১৭ গুণ। TMV এর দৈর্ঘ্য ২৮০ nm–৩০০ nm এবং প্রস্থ ১৫ nm–১৮ nm। RNA এবং প্রোটিন দিয়ে TMV গঠিত। এর বাইরে একটি পুরু প্রোটিন আবরণ আছে। প্রোটিন আবরণকে ক্যাপসিড বলে। ক্যাপসিড বহু উপ-

একক দ্বারা গঠিত। উপ এককে ক্যাপসোমিয়ার বলে। ক্যাপসোমিয়ার কতগুলো আঙ্গুরের থোকার ন্যায় পরপর সজ্জিত থাকে। TMV-তে প্রায় ২১৩০–২২০০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে একসূত্রক RNA কোর (core) আছে। RNA সূত্রটি ৬৫০০টি নিউক্লিয়োটাইড দ্বারা গঠিত। ওজন হিসেবে এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন। TMV এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রত্যেকটি প্রোটিন সাবইউনিটের আণবিক ওজন ১৭০০০ ডাল্টন।

চিত্র ৪.২ : TMV ভাইরাসের গঠন।

**ফায কী?** ফায (Phage) একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো 'to eat' বা ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐ সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। ফায-এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং একসময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি ফেলিক্স (d' Herelle Felix) এ ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী Twort ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস তথা $T_2$ আবিষ্কার করেন।

**২। $T_2$ ব্যাকটেরিওফায ($T_2$ Bacteriophage) :** এটি একটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। এর গঠন সম্বন্ধেও অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানা গেছে। $T_2$ ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা চলে, যথা : মাথা এবং লেজ।

**মাথা:** মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির প্রিজমের ন্যায় এবং প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০nm এবং প্রস্থ ৬৫nm। থলি আকৃতির এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে এই DNA গঠিত। এতে প্রায় ১৫০টি জিন থাকে। মাথার অধিকাংশ স্থানই ফাঁপা বলে মনে হয়। $T_2$ ফাযের DNA দ্বিসূত্রক এবং মোট ওজনের প্রায় ৫০%।

**লেজ :** মাথার পেছনে সরু অংশটির নাম লেজ। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে এবং লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। এর অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে ১টি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো কয়েকটি স্পাইক এবং ছয়টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

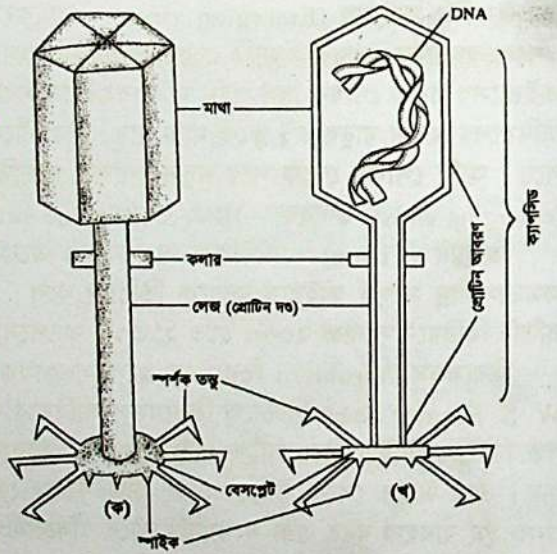

চিত্র ৪.৩ : $T_2$ ব্যাকটেরিওফায এর গঠন : (ক) পূর্ণাঙ্গ গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ।

এতে নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম, কোষ প্রাচীর ও অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ, ইত্যাদি নেই।

**ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Replication of virus) :** বিশেষ উপায়ে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে থাকে এবং প্রতিটি নতুন ভাইরাস দেখতে হুবহু একই রকম হয়। একটি পরিপূর্ণ ভাইরাস কখনো পূর্বস্থিত (Pre existing) কোনো ভাইরাস থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয় না। এছাড়া ভাইরাস অকোষীয় অর্থাৎ এরা সত্যিকার অর্থে জীব নয়। তাই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে জীবন চক্র বলা হয় না, বলা হয় সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া। ব্যাকটেরিওফায-এর সংখ্যাবৃদ্ধি দু'ভাবে ঘটে থাকে; যথা-(ক) লাইটিক চক্র বা ভাইরুলেন্ট চক্র এবং (খ) লাইসোজেনিক চক্র বা টেমপারেট দশা। T-সিরিজভুক্ত ফাযে অর্থাৎ $T_2$, $T_4$, $T_6$ ইত্যাদিতে লাইটিক চক্র ঘটে এবং ল্যামডা ফায ($\lambda$-Phage)-এ লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন হয়। নিচে এ দু'ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

**(ক) লাইটিক চক্র (Lytic cycle) :** যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে **লাইটিক চক্র বা বিগলনকারী চক্র** বলে। *Escherichia coli (E. coli)* নামক ব্যাকটেরিয়া কোষে $T_2$ ব্যাকটেরিওফাযের লাইটক চক্র নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সংঘটিত হয়।

**ধাপ-১ : সংযুক্তি বা পৃষ্ঠলগ্নীভবন (Attachment / Landing) :** $T_2$-ব্যাকটেরিওফায সাধারণত *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে থাকে। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরে ফাযপ্রোটিনের জন্য রিসেপ্টর সাইট (receptor site) থাকে। রিসেপ্টর সাইটের প্রোটিনের সাথে ফায ক্যাপসিডের স্পর্শক তন্তুর প্রোটিনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে $T_2$-ফায দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হলো আক্রমণের সূচনা।

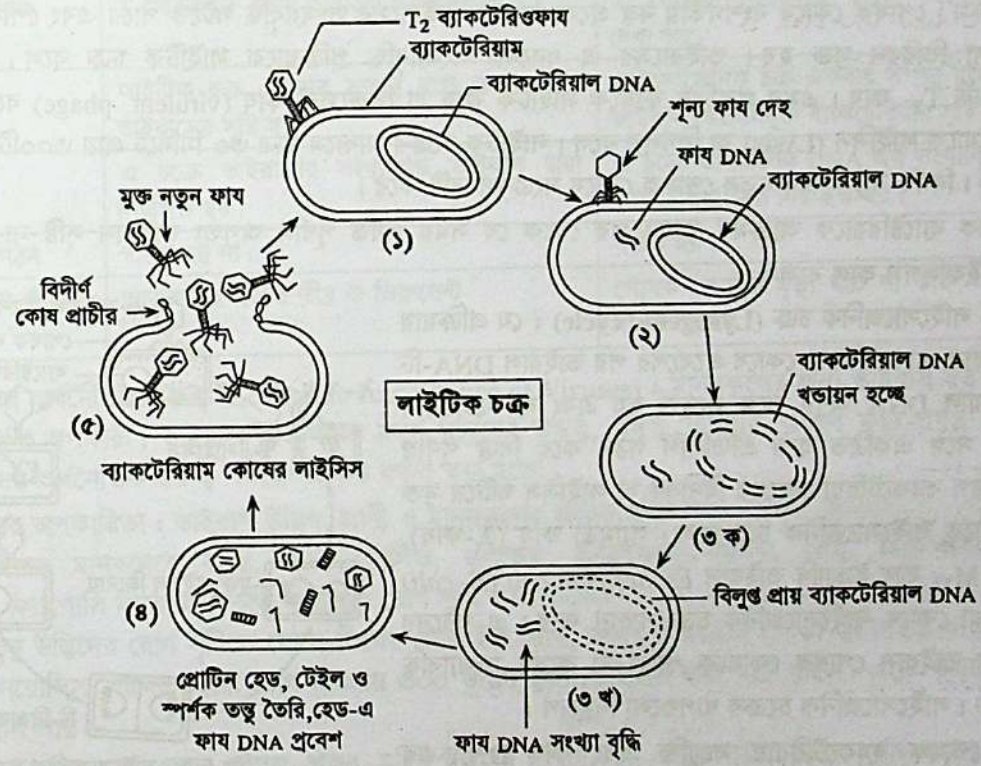


চিত্র ৪.৪ : $T_2$ ব্যাকটেরিওফায-এর লাইটিক চক্র।

**ধাপ-২ : ফায DNA অণু প্রবেশ (Penetration) :** ব্যাকটেরিওফাযের দণ্ডাকৃতি লেজটি সংকুচিত হয়ে বিশেষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংযোগ স্থানের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরি করে এবং ফায-DNA কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ মেমব্রেন ভেদ করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করিয়ে দেয়। শূন্য প্রোটিন আবরণটি বাইরেই থেকে যায়। [আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক ভাইরাসের সম্পূর্ণ দেহটিই পোষক কোষে প্রবেশ করে। পরে পোষক কোষের এনজাইম প্রোটিন আবরণটিকে বিগলিত করে ফেলে এবং ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) মুক্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে লাইটিক চক্র ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।]

**ধাপ-৩ : অনুলিপন (Replication) :** ফায DNA পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর তার নিজস্ব প্রোমোটার সিকুয়েন্স দ্বারা পোষক কোষের RNA পলিমারেজকে আকৃষ্ট করে। পোষক কোষের RNA পলিমারেজ ব্যবহার করে ফায mRNA তৈরি করে। ফায mRNA পরে প্রোটিন তৈরি করে এবং একটি বিশেষ প্রোটিন (প্রকৃতপক্ষে এনজাইম) *E. coli* DNA-কে খণ্ড বিখণ্ড করে নষ্ট করে দেয়। কাজেই পোষক কোষে ফায DNA-এর কোনো প্রতিযোগী থাকে না। ফায DNA নিউক্লিয়োটাইড (*E. coli* কোষের বিগলিত DNA থেকে মুক্ত হওয়া) কোষের রাইবোসোম, tRNA, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং নিজের ইচ্ছেমতো নতুন ফায DNA প্রতিলিপন করে নেয় এবং ফায কোট

প্রোটিন (coat protein) তৈরি করে। কোট প্রোটিন মাথা, লম্বা লেজ, স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি অংশ হিসেবে পৃথক পৃথকভাবে তৈরি হয়।

**ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া (Assemble) :** পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফায DNA এক একটি কোট প্রোটিনের মাথার অংশে প্রবেশ করে। পরে ক্রমান্বয়ে মাথার অংশের সাথে লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিওফায হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি (Release) :** পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিওফায তৈরি হওয়ার পর ফায একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি করে যার কার্যকারিতায় পোষক কোষের প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং নতুন সৃষ্ট ব্যাকটেরিওফাযসমূহ মুক্তভাবে বেরিয়ে আসে। মুক্ত হওয়া প্রতিটি ফায একটি নতুন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামকে আক্রমণ করতে সক্ষম। পোষক কোষে বংশগতীয় বস্তু প্রবেশের পর ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং পোষক কোষ ভেঙ্গে অনেকগুলো ভিরিয়ন মুক্ত হয়। ভাইরাসের এ ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে **লাইটিক চক্র** বলে। যেমন-*E. coli* আক্রমণকারী $T_2$- ফায। এমন প্রকৃতির ফাযকে **লাইটিক ফায বা ভিরুলেন্ট ফায** (virulent phage) বলে। কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ হওয়াকে **লাইসিস** (Lysis) বা বিগলন বলে। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে প্রায় ৩০০টি নতুন ফায সৃষ্টি হয়ে থাকে। নির্গত নতুন ফায নতুন পোষক কোষে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

**পোষক ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করার পর থেকে যে সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ অপত্য ভাইরাস সৃষ্টি না হয় সেই সময় কালকেই ইকলিপস কাল বলে।**

**(খ) লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic cycle) :** যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNA-টি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাকটেরিয়াল DNA-র সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ বা লাইসিস ঘটিয়ে মুক্ত হয় না তাকে লাইসোজেনিক চক্র বলে। ল্যামডা ফায ($\lambda$-ফায), $P_1$ ফায, $M_{13}$ ফায ইত্যাদি ভাইরাস *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া কোষে লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন করে। এ ধরনের চক্রে ফায ভাইরাস পোষক কোষকে ধ্বংস না করেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। লাইসোজেনিক চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

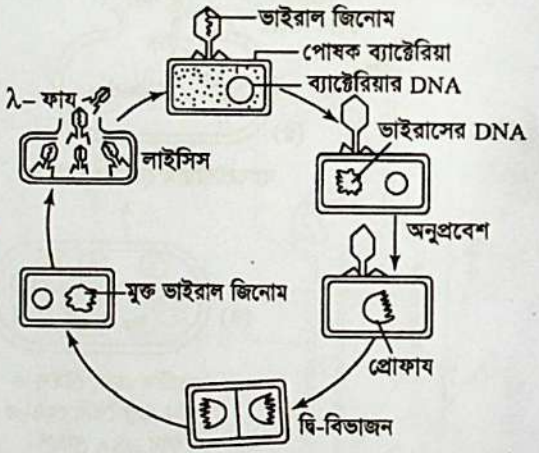

চিত্র ৪.৫ : লাইসোজেনিক চক্র

**১। পোষক ব্যাকটেরিয়ায় সংযুক্তি এবং ফায DNA-এর অনুপ্রবেশ :** লাইটিক চক্রের মতোই প্রথমে ফায ভাইরাস পোষক কোষপ্রাচীরকে ছিদ্র করে DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবিষ্ট করায় এবং শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরে থেকে যায়।

**২। ব্যাকটেরিয়া DNA এর সঙ্গে ভাইরাস DNA এর সংযুক্তি :** এ পর্যায়ে **নিউক্লিয়েজ এনজাইম ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে একটি জায়গায় কেটে ফেলে**। এই কাটা স্থানে ফায DNA-টি গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের সংযুক্তিতে **ইন্টিগ্রেজ** এনজাইম বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যাকটেরিয়ার DNA-র সঙ্গে সংযুক্ত ভাইরাস DNA-টিকে **প্রোফায** (prophage) বলে। এটি ব্যাকটেরিয়ায় সুপ্তাবস্থায় থাকে। ফায DNAসহ *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জিনোম একসাথে একটি নতুন জিনোম তৈরি করে। প্রত্যেকবার সংখ্যাবৃদ্ধির সময় ব্যাকটেরিয়াল DNA-এর অনুরূপ ভাইরাল DNA অণুটিরও প্রতিলিপি গঠিত হতে থাকে। এভাবে প্রতিটি অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় ভাইরাস DNA-র একটি কপি সংযুক্ত হতে থাকে। তবে প্রয়োজন হলে পোষক DNA থেকে ফায DNA পৃথক হয়ে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

**লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য**

| পার্থক্যের বিষয় | লাইটিক চক্র | লাইসোজেনিক চক্র |
|---|---|---|
| ১। গঠনগত | এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটিয়ে থাকে। | এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অণুটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে অনুলিপি গঠন করে। |
| ২। বিদারণ | পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয়। | পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয় না। |
| ৩। বিভিন্ন সিরিজ | T-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইটিক চক্র দেখা যায়। | λ (ল্যামডা)-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়। |
| ৪। সৃষ্টি | লাইটিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়। | লাইসোজেনিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জিনোমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়। |
| ৫। নিয়ন্ত্রণ | এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। | এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি পোষক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। |
| ৬। প্রোফাজ গঠন | গঠিত হয় না। | গঠিত হয়। |
| ৭। আক্রমণের তীব্রতা | আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভিরুলেন্ট | পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পারেট। |

**ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Viruses) :** মানবকুলের জন্য ভাইরাস যত না উপকারী তার চেয়ে বেশি অপকারী। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

**ভাইরাসের অপকারিতা :** ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যেমন–

১। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস, ক্যাপোসি সার্কোমা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২। বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে যেমন-সিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কুঁচকাইয়া যাওয়া), পেঁপের লিফকার্ল, ক্লোরোসিস, ধানের টুংরো রোগসহ প্রায় ৩০০ উদ্ভিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পায়।

৩। গরুর বসন্ত; গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর 'ফুট এ্যান্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।

৪। ফায ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে থাকে।

৫। বহুল আলোচিত 'এইডস্' রোগের কারণ হিসেবেও বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে দায়ী করেছেন। HIV (Human Immunodeficiency Virus) দিয়ে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome বা Acquired Immuno Deficiency Syndrome) রোগ হয়। AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (হ্রাস) Syndrome (অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ বিশেষ কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস বা কমে যাওয়াকে এইড্স (AIDS) বলে। HIV দিয়ে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে রোগীর অকাল মৃত্যু অবধারিত। বাংলাদেশে ক্রমেই এইডস্ রোগীর সংখ্যা এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

**৬। ইবোলা ভাইরাস (Ebola virus) :** ইবোলা ভাইরাস একসূত্রক RNA দ্বারা গঠিত। আফ্রিকার জায়ার-এ Ebola virus-এর আক্রমণে মহামারী দেখা দেয়। Ebola ভাইরাসের আক্রমণে দেহের কোষ ফেটে যায়। Ebola একটি মারাত্মক মারণ ভাইরাস। এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে আফ্রিকার কঙ্গোর ইবোলা নদীর তীরে প্রথম এক কৃষক মারা

যায়। উক্ত রোগী মারা গিয়েছিল চোখ, নাক, কান ও গলায় রক্তক্ষরণ হয়ে। তখন উক্ত নদীর নামানুসারে ঐ ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছিল ইবোলা ভাইরাস। স্পর্শের মাধ্যমেই নতুন ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হওয়ার ২-২১ দিনের মধ্যে রোগীতে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২০১৪ সালের শেষ এবং ২০১৫ সালের ১ম প্রান্তে পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মহামারী আকারে ইবোলা ছড়িয়ে পরে এবং ২৫০ স্বাস্থ্যকর্মীসহ প্রায় এগারো হাজার লোক মারা যায়। এর ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

৭। জিকা ভাইরাস (Zika virus) : জিকা ভাইরাস একটি ফ্লাভিভাইরাস। এটি Flaviviridae গোত্রের একটি RNA ভাইরাস যা ১৯৫২ সালে বানরের রক্ত এবং ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়ায় মানুষের দেহ থেকে পৃথক করা হয়।। ১৯৪৭ সালে উগান্ডার Zika Forest-এ বসবাসকারী রেসাস বানরের দেহে এ ভাইরাস প্রথম ধরা পরে। উগান্ডার ভাষায় *Zika* অর্থ Overgrown। বর্তমানে *Aedes aegypti, A. albopictus* মশকীর মাধ্যমে এই ভাইরাস সম্প্রতি ব্রাজিলসহ লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে মৃত্যু হার কম কারণ এর দ্বারা সাধারণত মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি আক্রান্ত হয় না। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়। জিকাবাহী মশকী উড়ে একদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে পারে, তাই এটি একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকার-প্রতিরোধ ডেঙ্গুর মতোই। এ ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে সামান্য জ্বর, র‍্যাশ, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, চক্ষু লাল হওয়া, মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, দেহে ফুসকুড়ি ওঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। গর্ভবতী নারীদের দেহে জিকার সংক্রমণ হলে নবজাতক শিশু অপেক্ষাকৃত ছোট আর অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়। চিকিৎসকের ভাষায় এ ত্রুটিকে মাইক্রোসেফালি বলা হয়। ব্রাজিলে সম্প্রতি এ ত্রুটিযুক্ত নবজাতক জন্মানোর তথ্য সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে।

জিকার সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো। এই অঞ্চলে এরই মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসটি। এছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অধিবাসীরাও সংক্রমণের ঝুকিতে রয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় ৬৭ বছর বয়সী এক মহিলার রক্তে জিকা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুয়ের্তো রিকো অঞ্চলে জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০ জন রোগীর মধ্যে প্রথম একজন রোগী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৮। নিপা ভাইরাস (Nipah virus) : নিপা ভাইরাস Paramyxoviridae পরিবারভুক্ত একটি RNA ভাইরাস যার গণ নাম *Henipavirus*. ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় শূকরের খামারে প্রথম ধরা পড়লেও দ্রুত দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পরে। বাদুর এই ভাইরাসটির বাহক এবং কাঁচা খেজুরের রসের মাধ্যমে এ ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত (অনুপ্রবেশ) হয়। এ ভাইরাসের আক্রমণে শ্বসন জটিলতায় মানুষসহ গৃহপালিত পশুপাখির মৃত্যু ঘটে।

৯। সম্প্রতি SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ভাইরাসের কারণে চীন, তাইওয়ান, কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। MERS (Middle East Respiratory Syndrome) ভাইরাসও একটি মারাত্মক ভাইরাস।

১০। বার্ড ফ্লু-একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বার্ড ফ্লু মহামারী আকারে হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছরই হাজার হাজার মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা $H_5N_1$ (Hemaglutinin types-5–Neuraminidase type-1) ভাইরাসের আক্রমণে হাঁস-মুরগিতে বার্ড ফ্লু নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় যা পোল্ট্রি শিল্পকে ধ্বংস করে।

১১। সোয়াইন ফ্লু- Swine Influenza virus (SIV) দ্বারা সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সোয়াইন ফ্লু শনাক্ত করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের Subtype $H_5N_1$ ও $H_1N_1$ (Hemaglutinin type-1–Neuraminidase type-1)-এর কারণে এই ফ্লু ঘটে থাকে। এ ভাইরাস দ্বারা মানুষ ও শূকর আক্রান্ত হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভারতে বহু লোক (২১০০) মারা যায় এবং ৩৪,০০০ মানুষ আক্রান্ত হয়। বিশ্বায়নের যুগে এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে মেক্সিকো থেকে সারা বিশ্বে।

১২। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দিয়ে মানুষের লিভার ক্যান্সার, পেপিলোমা ভাইরাস দিয়ে এনোজেনিটাল (জরায়ুর মুখ) ক্যান্সার, হার্পিস সিমপ্লেক্স দিয়ে ক্যাপোসি সার্কোমা ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৩। মানুষের অসুস্থ হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হলো সর্দিজ্বর (common cold)। বিভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলো ভাইরাস এর জন্য দায়ী; তাই এর জন্য কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

১৪। **চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) :** এটি এক প্রকার RNA ভাইরাসজনিত জ্বর। এ ভাইরাস α গোত্রভুক্ত। *Aedes aegypti* এবং *A. albopictus* মশকী দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে এ রোগ ছড়ায়। এ ভাইরাসটি প্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৫২ সালে আফ্রিকার তানজানিয়ায়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। ২০১৭ সালে এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা যায়। এ রোগে উচ্চ জ্বর, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, শরীরে র‍্যাশ ওঠা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকের জ্বর কমে গেলেও ব্যথা ৩–৪ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

১৫। **হিউম্যান হার্পিস ভাইরাসেস :** এটি *Rhadino* গণের এবং DNA ভাইরাস। এর দ্বারা ক্যাপোসি সারকোমা (HIV সম্পর্কীত রোগীদের ত্বক ক্যান্সার) রোগ হয়।

**ভাইরাসের উপকারিতা :** বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন :

১। বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।

২। ভাইরাস হতে 'জন্ডিস' রোগের টিকা তৈরি করা হয়।

৩। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৪। ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত 'জেনেটিক প্রকৌশল'-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫। ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৬। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রে NPV (Nuclear Polyhydrosis Virus) কে কীট পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

৭। ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে

৮। **টিউলিপ ফুল :** লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়ে। এবে টিউলিপ বলে। এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্য বেড়ে যায়।

৯। অস্ট্রেলিয়ার খরগোসের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। Myxovir সাহায্যে খরগোস নিধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

**ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণ :** ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণের দুটি উপায় আছে, যথা (১) ভ্যাক্সিনেশন বা টিকা প্রদান। মাধ্যমে মানব দেহের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করা হয়। টিকা প্রদান হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা (prevention), (২) অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ যা দিয়ে রোগের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। ইন্টারফেরন একটি অ্যান্টিভাইরাস ড্রাগ। অনেক উদ্ভিদেও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান আছে। ইন্টারফেরন ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

ভাইরাস দেহে কোনো মেটাবলিজমের ব্যবস্থা নেই, তাই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটি প্রতিরোধ করা যায় না। কিছু ভাইরাল এনজাইমকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

**কয়েকটি উদ্ভিদ ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম**

| সৃষ্ট রোগের নাম | পোষকদেহ | ভাইরাসের নাম |
|---|---|---|
| তামাকের মোজাইক রোগ | তামাক | টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus) |
| সিমের মোজাইক রোগ | সিম | বীন মোজাইক ভাইরাস (Bean Mosaic Virus) |
| টমেটোর বুশিস্টান্ট রোগ | টমেটো | বুশিস্টান্ট ভাইরাস (Bushystant Virus) |
| ধানের টুংরো রোগ | ধান | টুংরো ভাইরাস (Tungro Virus) |
| কলার বানচি টপ রোগ | কলা | বানচি টপ ভাইরাস (Banchy Top Virus) |
| গোলআলুর মোজাইক রোগ | গোলআলু | পট্যাটো মোজাইক ভাইরাস (Potato Mosaic Virus) |

**কয়েকটি প্রাণী ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম**

| সৃষ্ট রোগের নাম | পোষকদেহ | ভাইরাসের নাম |
|---|---|---|
| AIDS (রোগের নয়, লক্ষণ সমষ্টি ) | মানুষ | HIV ভাইরাস |
| ডেঙ্গু/ডেঙ্গী জ্বর | মানুষ | ফ্ল্যাভি ভাইরাস (Flavi virus) |
| বার্ড ফ্লু | হাঁস-মুরগি, পাখি | ইনফ্লুয়েঞ্জা ($H_5N_1$) ভাইরাস |
| চিকুনগুনিয়া | মানুষ | চিকুনগুনিয়া ভাইরাস |
| Swine flue | মানুষ, শূকর | ইনফ্লুয়েঞ্জা ($H_1N_1$) ভাইরাস |
| SARS | মানুষ | Nipah virus |
| জলাতঙ্ক | মানুষ | র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabis virus) |
| গুটি বসন্ত (small pox) | মানুষ | ভেরিওলা ভাইরাস (Variola virus) |
| জলবসন্ত (chicken pox) | মানুষ, পশুপাখি | Varicella-Zoster virus |
| ভাইরাল নিউমোনিয়া | মানুষ | Adeno virus |
| কোষের লাইসিস (lysis) | মানুষ | Ebola virus |
| সাধারণ সর্দি | মানুষ | Rhino virus |
| হাম | মানুষ | রুবিওলা ভাইরাস (Rubeola virus) |
| পোলিওমাইলাইটিস | মানুষ | পোলিও ভাইরাস (Polio virus) |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা | মানুষ | ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus) |
| হার্পিস | মানুষ | হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus) |
| জন্ডিস/লিভার ক্যান্সার | মানুষ | হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B) |
| পীত জ্বর | মানুষ | ইয়েলো ফিভার ভাইরাস (Yellow Fever virus) |
| গো-বসন্ত | গরু | ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস (Vaccinia virus) |
| পা ও মুখের ক্ষত (ফুট অ্যান্ড মাউথ) | গরু/ভেড়া/ছাগল/মহিষ | 'ফুট অ্যান্ড মাউথ' ভাইরাস (Foot and Mouth virus) |
| ইঁদুরের টিউমার | ইঁদুর | পলিওমা ভাইরাস (Polioma virus) |
| ক্যাপোসি সার্কোমা | মানুষ | হার্পিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex) |
| এনোজেনিটাল ক্যান্সার | মানুষ | পেপিলোমা ভাইরাস (Pepiloma virus) |

**কাজ:** $T_2$ ফায-এর গঠন চিত্রের একটি পোস্টার অঙ্কন কর এবং ক্লাসে উপস্থাপন কর।
**উপকরণ :** পোস্টার পেপার, পেন্সিল, ইরেজার, রং পেন্সিল ইত্যাদি।

## ভাইরাসঘটিত রোগসমূহ (Viral diseases)

ভাইরাস বলতেই রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু বোঝায়। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখির বহু রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি ভাইরাসঘটিত রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো।

**(ক) ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis) :** সাধারণত লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বা সংক্ষেপে হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারে স্থায়ী আক্রমণ গড়ে তোলে, যা ১০-১৫ বছরের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়।

রোগের কারণ : হেপাটাইটিস রোগের কারণ হেপাটাইটিস-B ভাইরাস (HBV)। এছাড়া হেপাটাইটিস-A ভাইরাস (HAV); হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV) যাকে বলা হয় 'তুষের আগুন' /নিরব ঘাতক এবং আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ সময় মারা যায়; হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) ও হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV) দিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। অধিকাংশ হেপাটাইটিসই হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের আক্রমণে ঘটে থাকে। হেপাটাইটিস-C অবশ্য হেপাটাইটিস-B অপেক্ষা অধিক মারাত্মক।

হেপাটাইটিস-B ভাইরাস একটি DNA ভাইরাস। এর DNA দ্বিসূত্রক এবং বৃত্তাকার। এই ভাইরাসে প্রোটিন আবরণের ওপর আর একটি আবরণ থাকে। এ ভাইরাস বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন—

- আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
- অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

এছাড়া মাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিস্টেইন বার ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, হার্পিস জোস্টার ভাইরাস কোনো সময় শিশুর হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। নিম্নে হেপাটাইটিস ভাইরাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

| বৈশিষ্ট্য | HAV | HBV | HCV | HDV | HEV |
|---|---|---|---|---|---|
| ভাইরাস গ্রুপ | এন্টারো ভাইরাস | হেপাডিএনএ ভাইরাস | ফ্ল্যাভি ভাইরাস | অসম্পূর্ণ ভাইরাস | ক্যালিসি ভাইরাস |
| নিউক্লিক অ্যাসিড | RNA | DNA | RNA | RNA | RNA |
| আয়তন | ২৭ nm | ৪২ nm | ৩০-৩৮ nm | ৩৫ nm | ২৭ nm |
| সুপ্তিকাল | ১৪-২৮ দিন | ৪৫-১৮০ দিন | ১৪-১৮০ দিন | ২১-৪৯ দিন | ২১-৫৬ দিন |

**রোগের লক্ষণ :** রক্তের মাধ্যমে এই রোগ দেহে প্রবেশ করে এবং লিভারে নীত হয় ও লিভারকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড (সুপ্তিকাল) ৪৫-১৮০ দিন। ক্রমশ জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব, দুর্বল বোধ, পাতলা পায়খানা, হাড়ের গিঁটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে প্রস্রাব হলুদ হয়, চোখের সাদা অংশ এবং সমস্ত শরীর হলুদ বর্ণ দেখায়, পেটে ও পায়ে পানি জমা হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় অস্বস্তি অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। রক্তে বিলিরুবিনের এবং SGPT এর মাত্রা বৃদ্ধি। এ দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। হেপাটাইটিস B নির্ণয়ের জন্য রক্তের এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পরীক্ষা করতে হয়।

**নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার :** রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া দরকার। সাধারণত এর কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। নিয়মিত চিকিৎসায় সুস্থ থাকা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া যায় না। এর মূল চিকিৎসা হলো রোগীকে ১০-১২ দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখা। গ্লুকোজের সরবত খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। অড়হড় পাতা, ভুঁই আমলার পাতা ইত্যাদির রস খাওয়ায়ে উপকার পেয়েছেন বলেও অনেকে দাবি করেছেন। Amoxycillin, Metronidazole ভিটামিন-সি প্রভৃতি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

**প্রতিরোধ :** প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস-B-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পরপর এবং ৪র্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রক্ত পরীক্ষা করে এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পজিটিভ হলে B-ভাইরাস আক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে ভ্যাকসিন দেয়া যায় না। মা থেকে শিশুতে এই রোগ ছড়াতে পারে, তাই সাবধান হতে হবে। রক্ত দেওয়া-নেওয়ায় সাবধান হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। সেলুনে সেভ করা পরিহার করতে হবে। প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত টয়লেট্রিজ দ্রব্য যেমন ট্রুথব্রাশ, রেজার, নেইল কাটার ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।

### (খ) ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

**রোগের কারণ:** ডেঙ্গু (প্রকৃত উচ্চারণ ডেঙ্গী) একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এই ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্ল্যাভিভাইরাস বা ডেঙ্গী ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti* L. ও *Aedes albopictus* নামক মশকী (স্ত্রী মশা) আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়।

**রোগের লক্ষণ :** (i) **সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর :** প্রথমে শীত শীত ভাব হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। জ্বর ১০৩-১০৫° (ডিগ্রি) ফারেনহাইট হয়ে থাকে। সাধারণত স্ত্রী ডেঙ্গু মশা কামড়ানোর ২-৭ দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর তীব্র মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেট ব্যথা, কপাল ব্যথা ও গলা ব্যথা হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে (মাংসপেশি, পিঠ, কোমর, ঘাড়, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়) ব্যথা হয়। মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। একে হাড়ভাঙ্গা জ্বর বলে। শরীরে লালচে রঙের র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) দেখা দিতে পারে। বমি বমি ভাব ও খাবারে অরুচি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ে পৌছালে রক্তক্ষরণ (bleeding) হয়।

**(ii) হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর :** সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখের কোণে রক্ত জমাট হতে পারে। রক্তে প্লেটিলেট (অণুচক্রিকা) ভীষণ হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

**(iii) ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম :** হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়।

তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

**রোগ নির্ণয় : সেরোলজি :** রক্ত পরীক্ষায় IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রামিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

**প্লেটিলেট পরীক্ষা :** রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/$mm^3$ এর অনেক নিচে নেমে আসে।

**সেল কালচার :** রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

**প্রতিকার/চিকিৎসা :** ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিলে মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে, তাই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মায়েদের ডেঙ্গু হলে অন্যান্য রোগীর মতোই যত্ন নিতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

**প্রতিরোধ :** ডেঙ্গু মশা নিধন করাই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এই মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, কাজেই দিনের বেলায় মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে। রোগ প্রতিরোধে দিনের বেলায় মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। এই মশা ময়লা পানিতে জন্মায় না, বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন কনটেইনারে (ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি পাতিল, ডাবের খোসা, ড্রাম ইত্যাদি) রক্ষিত বা সঞ্চিত পরিষ্কার পানিতে জন্মায়, তাই পানির এসব উৎস ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পানি জমতে না দেয়া। পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য নিয়মিত পতঙ্গনাশক স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে পতঙ্গনাশক ছাড়াই ডেঙ্গু মশা নিধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

**(গ) পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ (Ringspot or mosaic disease of Papaya) :** পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ শুরু হয়েছে। পেঁপের রোগ-বালাই অপেক্ষাকৃত কম হলেও কখনো কখনো ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো ভাইরাসঘটিত রিংস্পট রোগ। বাংলাদেশসহ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পেঁপে গাছে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট (Ringspot)।

**রোগের কারণ :** একটি ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি সাধারণভাবে Papaya ringspot virus বা PRSV নামে পরিচিত। এর গণ *Potyvirus*, গোত্র Potyviridae. PRSV কতকটা দণ্ডাকৃতির, এটি ৭৬০-৮০০ nm

লম্বা এবং এর ব্যাস ১২ nm। পেঁপে ছাড়াও এ ভাইরাস কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদে মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে। ক্যাপসিডের বাইরে এর কোনো আবরণ নেই। এটি একটি RNA ভাইরাস। PRSV এর দুটি প্রকরণের (PRSV-p এবং PRSV-w) মধ্যে PRSV-p দিয়ে পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়।

**সংক্রমণ :** জাব পোকা ও সাদা মাছি (Melon Aphid- *Aplus gossypii* and Peach Aphid- *Myzus persicae*) দ্বারা পেঁপে গাছে পেঁপের রিংস্পট রোগের ভাইরাস সংক্রমিত হয়। কোনো আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে জাব পোকা খাদ্যগ্রহণ করলে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইরাস পোকার দেহে চলে আসে এবং সাথে সাথে কোনো সুস্থ উদ্ভিদে বসলে উহা ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। পোকার দেহে এ ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। যদি পেঁপে বাগানের গাছগুলো পোকার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং বাগানে জাব পোকার সংখ্যা খুব বেশি থাকে তাহলে এ রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ৪ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ ছাঁটার সময় যান্ত্রিকভাবে এ রোগ বিস্তার ঘটতে পারে।

**রোগ লক্ষণ (Symptoms) :** রোগের নাম থেকেই লক্ষণ অনুমান করা যায়। Ring = বৃত্ত, Spot = দাগ অর্থাৎ বৃত্তাকার দাগ প্রকাশ পায়। বৃত্তাকার দাগের প্রকৃতি হলো কেন্দ্রাভিমুখী (Concentric)। রোগাক্রান্ত গাছে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(i) উদ্ভিদ জন্মের সাথে সাথে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। সংক্রমণের ৩০–৪০ দিনের মধ্যে প্রথম রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।
(ii) ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় হলদে-সবুজ মোজাইকের মতো দাগ পড়ে।
(iii) কাণ্ড, পাতার বোঁটা ও ফলে তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত গাঢ় সবুজ দাগ, স্পট বা রিং সৃষ্টি হয়।
(iv) অপেক্ষাকৃত কম বয়সের পাতায়ই রোগ লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়।
(v) আক্রমণ প্রকট হলে পাতায় বহুল পরিমাণে মোজাইক সৃষ্টি হয়, পাতা আকৃতিতে ছোট ও কুকড়ে যায়, গাছের মাথায় বিকৃত আকৃতির ক্ষুদ্রাকায় কিছু পাতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পাতা ঝরে পড়ে। কখনো কখনো পাতার কেবল শিরাগুলো থাকে।
(vi) আক্রান্ত ফলের উপর পানি ভেজা গোলাকার দাগ পড়ে এবং দাগের মধ্যবর্তী স্থান শক্ত হয়ে যায়।
(vii) পেঁপে হলুদ হয়ে যায়, রিংস্পট লক্ষণ প্রকাশিত হয়, আকার ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় পুষ্ট হবার আগেই ঝরে যায়।
(viii) পেঁপের মিষ্টতা ও পেপেইন হ্রাস পায়।
(ix) ফলন শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

**প্রতিকার/নিয়ন্ত্রণ**

১। জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২। জাল (net) দিয়ে পুরো জমি (পেঁপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড নামক পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে।
৩। এফিড নামক পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে (রগর বা রক্সিয়ন বা পারফেকথিয়ন 40 ইসি অথবা মেটাসিসটক্স 25 ইসি কীটনাশক 2 মিলিলিটার/1লিটার পানিতে মিশিয়ে) করা যেতে পারে।
৪। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না।
৫। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের প্রুনিং (পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি) বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রম ঘটে থাকে।
৬। বাংলাদেশি বিজ্ঞানি ড. মাকসুদুল আলম কর্তৃক জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিস্কৃত নতুন জাতের ক্রস প্রোটেকশন করে আবাদ করলে রোগমুক্ত ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. মাকসুদুল আলম আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জিনরহস্য উন্মোচন করেছেন। (এখন তিনি প্রয়াত।)

**প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা**

১। যে এলাকাতে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সে এলাকায় পেঁপের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে এবং দূরে নতুন এলাকায় রোগমুক্ত চারা দিয়ে চাষ শুরু করতে হবে।

২। ক্রস-প্রোটেকশন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত চারাগাছ থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। মৃদু প্রকৃতির PRSV জীবাণুকে প্রাণিদেহে ভাইরাল টিকাদানের মতো পোষক উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে গাছকে ভাইরাস প্রতিরোধী করা।

৩। PRSV সাধারণত বীজের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় না, তবে প্রকটভাবে আক্রান্ত পেঁপের বীজ ব্যবহার করলে তা ইনোকুলামের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই ঐ ধরনের বীজ ব্যবহার না করা।

৪। ট্রান্সজেনিক জাত ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ। জিনগান পদ্ধতি ব্যবহার করে PRSV'S Coat protein জিনকে ভ্রূণ টিস্যুতে সংযুক্ত করে নতুন ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯৯৮ সালে। ট্রান্সজেনিক জাত দুটি হলো PRSV মুক্ত রেইনবো (Rainbow) ও সানআপ (Sunup)। এই ট্রান্সজেনিক জাত (GMO) PRSV দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

## ব্যাকটেরিয়া (Bacteria, একবচনে Bacterium)

গ্রিক শব্দ *Bakterion* = little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দটির উৎপত্তি। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে ব্যাকটেরিয়াম) এক ধরনের ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী (হল্যান্ড) অ্যান্টনি ভ্যান লীউয়েনহুক (Antony Van Leeuwenhoek, 1632–1723) ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এগুলোর নাম দেন animalcule বা ক্ষুদ্র প্রাণী। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডন রয়্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত তার অঙ্কিত ছবিতে তিন আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি দেখা যায়। সর্ব প্রথম আণুবীক্ষণিক সমীক্ষায় আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাকে ব্যাকটেরিওলজি ও প্রোটোজুওলজির জনক বলা হয়ে থাকে। জার্মান বিজ্ঞানী এরেনবার্গ (Christian Gottfried Ehrenberg) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এসব ক্ষুদ্রজীবদের ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (Louis Pasteur) ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়ার ওপর ব্যাপক গবেষণা এবং ব্যাকটেরিয়া তত্ত্বকে (germ theory of disease) প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে লুই পাস্তরকে অনেকেই আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলতে চান। জার্মান ডাক্তার রবার্ট কক (Robert Koch) অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীর বহু রোগের কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। তিনি যক্ষ্মা রোগের জন্য দায়ী *Mycobacterium tuberculosis* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন এবং এজন্য তাঁকে ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানুষের দেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে। মানুষের অন্ত্র ও ত্বকে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া থাকে। এদের বেশিরভাগই কোনো ক্ষতি করে না। মানুষের দেহে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশি ভয়ানক এবং এ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে AIDS সংক্রমণে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে।

বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আবাস, রোগতত্ত্ব, বংশবিস্তার ইত্যাদি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় তাকে **ব্যাকটেরিওলজি** বলে।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী (Prokaryotic) জীব। আদিকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না, যেমন নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি কমপ্লেক্স, লাইসোজোম, সাইটোস্কেলেটন নেই। কেবলমাত্র রাইবোসোম থাকে। কোষে একটি দ্বিসূত্রক অখণ্ড, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যা ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এতে হিস্টোন-প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এদের কোষে জড় কোষ প্রাচীর থাকে। তাই এরা উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন।

ব্যাপক অর্থে ব্যাকটেরিয়া বলতে আর্কিব্যাকটেরিয়া (গ্রিক *archaios* = ancient বা আদি), ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রুপকে বোঝায়। বর্তমানে **Mycoplasma**-কেও ব্যাকটেরিয়া হিসেবে ধরা হয়। এর মধ্যে আর্কিব্যাকটেরিয়া অন্যান্য গ্রুপ থেকে আলাদা ধরনের। ১৯৭০ সালের আগে আর্কিব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার তেমন পার্থক্য জানা সম্ভব হয়নি, ১৯৯৬ সালে একটি আর্কিব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্সিং করার পর এদের মধ্যকার প্রকট পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায় মোট ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য সকল জীব গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে এদের rRNA-এর বেস সিকুয়েনসেস ব্যাকটেরিয়ার সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা সুদৃঢ় করে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী জীবরাজ্যকে তিনটি Domain বা অধিরাজ্যে ভাগ করতে চান।

অধিরাজ্য-১ : Archaea : রাজ্য Archaebacteria
অধিরাজ্য-২ : Bacteria : রাজ্য Eubacteria
অধিরাজ্য-৩ : Eukarya : রাজ্য Protista, Fungi, Plantae, Animalia

| বৈশিষ্ট্য | আর্কিব্যাকটেরিয়া | ব্যাকটেরিয়া |
|---|---|---|
| ১। কোষপ্রাচীর | পেপটিডো গ্লাইকান নেই | প্রধান বস্তু পেপটিডোগ্লাইকান |
| ২। মেমব্রেন লিপিড | ইথার লিংকড, শাখান্বিত | এস্টার লিংকড, অশাখ |
| ৩। ইনহিবিটর tRNA | মেথিওনিন | ফরমাইল মেথিওনিন |
| ৪। RNA পলিমারেজ | একাধিক | এক ধরনের |
| ৫। ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট | Bacterio rhodopsin | Bacterial chlorophyll, chlorophyll-a |

আর্কিব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে। এদের কতক Salt lover (Halophiles), কতক Heat lover (Thermophiles) কতক Heat and acid lover (Thermoacidophiles) এবং কতক Methane generater (Methanogens).

*Methanopyrus* ১১০° সে. তাপমাত্রায়ও টিকে থাকে, ভালো বৃদ্ধি ঘটে ৯৮° সে. তাপমাত্রায়, কিন্তু তাপমাত্রা ৮৪° সে. এর কম হলে মরে যায়। Methanogens প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে দুই বিলিয়ন টন মিথেন গ্যাস মুক্ত করে।

যাইহোক, এ পুস্তকে কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh পুস্তকে বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ৪৭২ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ প্রজাতির সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ৬০ প্রজাতির প্রোটিওব্যাকটেরিয়া, ৪২ প্রজাতির ফিরমিকিউট্স এবং ৭০ প্রজাতির অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া।

ব্যাকটেরিয়া হলো জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট, এককোষী, আণুবীক্ষণিক, আদিকেন্দ্রিক অণুজীব যা সাধারণত ক্লোরোফিল বিহীন এবং প্রধানত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। ৩৬০ কোটি বছর পূর্বে আর্কিওজোইক যুগে আদি কোষী জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল। নিচে ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

### ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট আকারের জীব, সাধারণত ০.২–৫.০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে, অর্থা আণুবীক্ষণিক (microscopic)।

২। এরা এককোষী জীব, তবে একসাথে অনেকগুলো কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকতে পারে।

৩। ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক (প্রাককেন্দ্রিক = Prokaryotic)। কোষে 70S রাইবোসোম থাকে; অন্য ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না।

৪। ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপ্রোটিন, সাথে মুরামিব (Muramic acid) এবং টিকোয়িক অ্যাসিড (Teichoic acid) থাকে।

৫। এদের বংশগতীয় উপাদান (genetic material) হলো একটি দ্বিসূত্রক, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু, ব্যাকটেরিয়্যাল ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এটি সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত, এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া কোষে DNA অবস্থানের অঞ্চলকে নিউক্লিয়য়েড বলা হয়।

৬। এদের বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়া দ্বি-ভাজন (binary fission)। ব্যাক্টেরিয়ার দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৩০ মিনিট সময় লাগে।

৭। এদের কতক পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী, অধিকাংশই মৃতজীবী এবং কিছু স্বনির্ভর (autophytic)।

৮। এরা সাধারণত বেসিক রং ধারণ করতে পারে (গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ)।

৯। ফায ভাইরাসের প্রতি এরা খুবই সংবেদনশীল।

১০। এদের অধিকাংশই অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।

১১। ব্যাক্টেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু গঠন করে। এ অবস্থায় এরা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

১২। এরা -১৭ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাঁচে।

১৩। ক্রোমোসোম না থাকায় মাইটোসিস ও মায়োসিস ঘটে না।

১৪। এদের কতক বাধ্যতামূলক অবায়বীয় (obligate anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন থাকলে বাঁচতে পারে না। উদা: *Clostridium*। কতক সুবিধাবাদী অবায়বীয় (facultative anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও বাঁচতে পারে। কতক বাধ্যতামূলক বায়বীয় (obligate aerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। উদা: *Azotobacter beijerinckia*।

**ব্যাকটেরিয়ার বিস্তৃতি ও আবাসস্থল :** ব্যাকটেরিয়া মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। মানুষের অন্ত্রেও ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এর মধ্যে *Escherichia coli* (*E. coli*) আমাদেরকে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স সরবরাহ করে থাকে। প্রকৃতিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অর্থাৎ −17°C তাপমাত্রা থেকে শুরু করে 80°C তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। মাটি বা পানিতে যেখানে জৈব পদার্থ বেশি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও সেখানে বেশি। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ আবাদি মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাটির যত গভীরে যাওয়া যাবে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণও তত কমতে থাকে এবং সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও কমতে থাকে। জৈব পদার্থসমৃদ্ধ জলাশয়েও বিপুল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া বাস করে। বায়ুতেও ব্যাকটেরিয়া আছে তবে বায়ুস্তরের অনেক উঁচুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না। এক গ্রাম মাটিতে প্রায় ৪০ মিলিয়ন এবং এক মিলিলিটার মিঠা পানিতে প্রায় ১ মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে। অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে। আবার অনেকে প্রাণীর অন্ত্রে মিথোজীবী হিসেবে বাস করে।

## ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়াকে তাদের কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির তারতম্য, ফ্ল্যাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা, স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। নিম্নে এদের মধ্য থেকে তিন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো :

### (ক) কোষের আকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ

কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যথা- ১। কক্কাস, ২। ব্যাসিলাস, ৩। কমাকৃতি, ৪। স্পাইরিলাম, ৫। বহুরূপি, ৬। স্টিলেট বা তারকাকার এবং ৭। বর্গাকৃতির।

**১। কক্কাস (Coccus)** [বহুবচনে কক্কাই, Pl. Cocci] : যে সব ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি প্রায় গোলাকার তাদেরকে কক্কাস বলে। কক্কাসকে আবার ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

**(ক) মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস (Micrococcus) :** যেসব ব্যাকটেরিয়া গোলাকার এবং একা একা থাকে তাদেরকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস বলে; উদাহরণ- *Micrococcus denitrificans.*

**(খ) ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus) :** দেখতে গোলাকার এবং এ ব্যাকটেরিয়াসমূহ জোড়ায় জোড়ায় থাকে; উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae.*

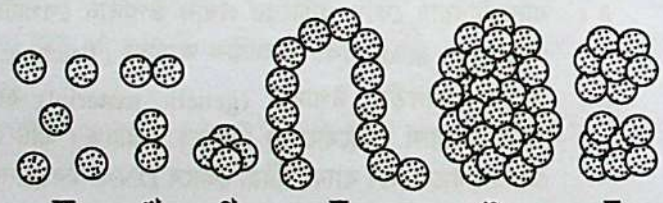

চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া (ক) মাইক্রোকক্কাস, (খ) ডিপ্লোকক্কাস, (গ) টেট্রাকক্কাস, (ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস, (ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং (চ) সারসিনা।

**(গ) টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus) :** যখন চারটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একই তলে একত্রে বাস করে; উদাহরণ- *Gaffkya tetragena.*

(ঘ) **স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus)** : এরাও দেখতে গোলাকার এবং চেইন (chain) বা মালার মতো সাজানো থাকে; উদাহরণ- *Streptococcus lactis.*

(ঙ) **স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus)** : এগুলো গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া এবং অনিয়মিত গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে, যা দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের থোকার ন্যায় দেখায়; উদাহরণ- *Staphylococcus aureus.*

(চ) **সারসিনা (Sarcina)** : এগুলো দেখতে গোলাকার। কক্কাস জাতীয় ব্যাক্টেরিয়াগুলো একত্রে সমান সমান দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় একটি ঘনতলের মতো গঠন তৈরি করে তখন তাকে সারসিনা বলে; উদাহরণ- *Sarcina lutea.*

২। **ব্যাসিলাস (Bacillus)** [বহুবচনে ব্যাসিলি Pl. bacilli] : দণ্ডাকৃতির ব্যাক্টেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Clostridium botulinum, Pseudomonas tabaci* ইত্যাদি। ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া নিম্নলিখিত ধরনের-

- **মনোব্যাসিলাস (Monobacillus)** : যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া এককভাবে থাকে তখন তাকে মনোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Escherichia coli.*
- **ডিপ্লোব্যাসিলাস (Diplobacillus)** : দুটি ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত অবস্থায় থাকলে তাকে ডিপ্লোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Moraxella lacunata.*

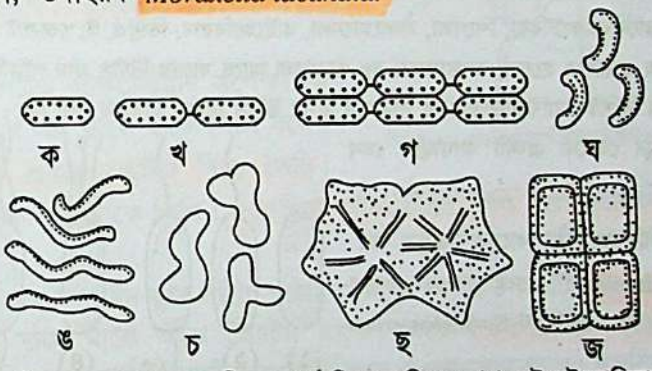


চিত্র ৪.৭ : (ক) মনোব্যাসিলাস, (খ) ডিপ্লোব্যাসিলাস, (গ) স্ট্রেপটোব্যাসিলাস. (ঘ) কমাকৃতি, (ঙ) স্পাইরিলাম, (চ) বহুরূপি, (ছ) তারকাকার এবং (জ) বর্গাকৃতির।

- **স্ট্রেপটোব্যাসিলাস (Streptobacillus)** : দুইয়ের অধিক ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত হয়ে লম্বা সূত্রাকার গঠন তৈরি করে তখন তাকে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Streptobacillus moniliformis.*
- **কক্কোব্যাসিলাস (Coccobacillus)** : যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো সামান্য লম্বা বা কতকটা ডিম্বাকার হয় তখন তাকে কক্কোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Salmonella, Mycobacterium.*
- **প্যালিসেড ব্যাসিলাস (Palisade bacillus)** : কখনো কখনো ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে অলীক টিস্যুর ন্যায় গঠন তৈরি করে তখন তাকে প্যালিসেড ব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Lampropedia* sp.

৩। **কমাকৃতি বা ভিব্রিও (Comma or Vibrio)** : যেসব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কমা চিহ্নের ন্যায় তাদের কমা ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদাহরণ- *Vibrio cholerae.*

৪। **স্পাইরিলাম (Spirillum)** [ বহুবচনে স্পাইরিলা Pl. spirilla ] বা **সর্পিলাকার** : প্যাঁচানো বা সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে; উদাহরণ- *Spirillum minus.*

৫। **বহুরূপি (Pleomorphic)** : সুনির্দিষ্ট আকারবিহীন ব্যাকটেরিয়াকে বহুরূপি ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদা. *Rhizobium* sp.

৬। **স্টিলেট বা তারকাকার (Stellate or Star shaped)** : এরা দেখতে অনেকটা তারকার ন্যায়; যেমন-*Stella* sp.

৭। **বর্গাকৃতির (Square shaped)** : চার বাহুবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকেই বর্গাকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; যেমন- *Haloquadratum walsbyi.*

৮। **ফিলামেন্টাস (Filamentus)** : এদের গঠন যখন সূত্রাকার হয় তখন তাকে ফিলামেন্টাস বলে, যেমন- *Candidatus savagella*।

**(খ) রঞ্জনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ** (সিলেবাস বহির্ভূত কিন্তু জানা জরুরি)

১৮৮৪ সালে ড্যানিশ চিকিৎসক Hans Christian Gram ব্যাকটেরিয়ার জন্য একটি রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাকে বলা হয় Gram staining বা গ্রাম রঞ্জন পদ্ধতি।

স্লাইডে ব্যাকটেরিয়া স্মিয়ার (Smear) নিয়ে তাতে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং দিতে হবে, এরপর আয়োডিন দিতে হবে। এরপর এটি অ্যালকোহলে ধুয়ে স্যাফ্রানিন-এর লাল রং-এ কাউন্টার স্টেইন করতে হবে। যে সব ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে ব্লু থেকে পারপল হবে); যেমন-*Bacillus subtilis*. যে সব ব্যাকটেরিয়াতে ভায়োলেট রং ধুয়ে চলে যাবে এবং স্যাফ্রানিনের লাল রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে পিঙ্ক থেকে লাল হবে): যেমন-*Salmonella typhi*.

চিকিৎসা ক্ষেত্রে গ্রাম স্টেইনিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেনিসিলিন বা পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, ফলে নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। আবার টেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন জাতীয় ওষুধ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়, তাই নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। এভাবে রোগী আরোগ্য হয়।

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, ক্লসট্রিডিয়াম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রাম পজিটিভ। এনটেরোব্যাকটেরিয়া, সকল সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শিগেলা, সালমোনেলা, রাইজোবিয়াম, ভিব্রিও, ই. কোলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ।

আমাদের নিজস্ব গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে বহু গাছপালা আছে যাদের নির্যাস গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে এসব উদ্ভিদ নির্যাস ব্যবহার করা যায়। *Polygonum lapathifolium* এমন একটি আগাছা। প্রয়োজন ছাড়া কোনো একটি আগাছাও যেন আমরা নষ্ট না করি।

**(গ) ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ** (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়)

১। **অ্যাট্রিকাস (atrichous)** : এদের কোষে কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না; উদাহরণ-*Corynebacterium diptheriae*.

২। **মনোট্রিকাস (monotrichous)** : এদের কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Vibrio cholerae*.

৩। **অ্যাম্ফিট্রিকাস (amphitrichous)** : এদের কোষের দুই প্রান্তে একটি করে ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Spirillum minus*।

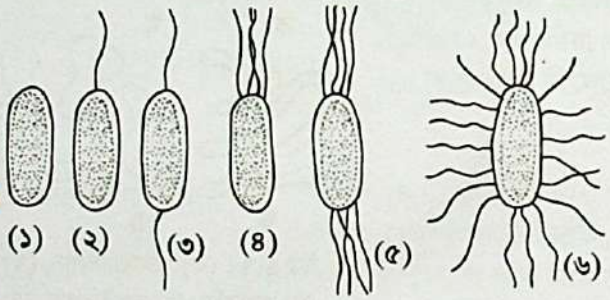


চিত্র ৪.৮ : ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ।
(১) অ্যাট্রিকাস (২) মনোট্রিকাস (৩) অ্যাম্ফিট্রিকাস
(৪) সেফালোট্রিকাস(৫) লফোট্রিকাস (৬) পেরিট্রিকাস।

৪। **সেফালোট্রিকাস (cephalotrichous)** : এদের কোষের এক প্রান্তে একগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে ; যেমন-*Pseudomonas fluorescens*।

৫। **লফোট্রিকাস (lophotrichous)** : এদের কোষের দুই প্রান্তে দুইগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন-*Spirillum volutans*।

৬। **পেরিট্রিকাস (peritrichous)** : এদের দেহের সবদিকেই ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন- *Salmonella typhi*।

## একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন (Structure of a Typical Bacterium)

ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে, এদের কোষীয় গঠন বৈশিষ্ট্যেও তেমনই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

**১। কোষ প্রাচীর** : প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান মিউকোপ্রোটিন জাতীয় যাকে মিউরিন বা পেপটিডোগ্লাইকান বলে। পেপটিডোগ্লাইকান একটি কার্বোহাইড্রেট পলিমার। পেপটিডোগ্লাইকানের সাথে কিছু পরিমাণ মুরামিক অ্যাসিড এবং টিকোয়িক অ্যাসিডও থাকে। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি বেশ পুরু থাকে যা ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি পাতলা থাকে এবং এর উপর ফসফোলিপিড বা লিপোপলিসেকারাইড-এর একটি

পাতলা স্তর থাকে। এজন্য এরা ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে না। মাইকোপ্লাজমাতে জড় প্রাচীর নেই বললেই চলে। এরা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া। লাইসোজাইম এনজাইম দ্বারা এর কোষ প্রাচীর বিগলিত হয়।

২। **ক্যাপসিউল** : বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কার্বোহাইড্রেট বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। একে স্লাইম স্তরও বলা হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

৩। **ফ্ল্যাজেলা** : অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা নলাকার রডবিশেষ। ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যাজেলা গঠিত। প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের তিনটি অংশ থাকে। যথা- (i) সূত্র (ii) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (iii) ব্যাসাল বডি। ব্যাসাল বডি ফ্ল্যাজেলামকে কোষের প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত রাখে। ফ্ল্যাজেলা ব্যাকটেরিয়ার চলনে অংশগ্রহণ করে।

৪। **পিলি** : কতগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংখ্যায় অধিক লোম সদৃশ অঙ্গ থাকে যাকে পিলি বলে। পিলি, পিলিন (Pilin) নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি। পোষক কোষের সাথে সংযুক্তির কাজ করে থাকে পিলি। গনোরিয়া ব্যাকটেরিয়া পিলি দ্বারা পোষক কোষের সাথে সংযুক্ত হয়।

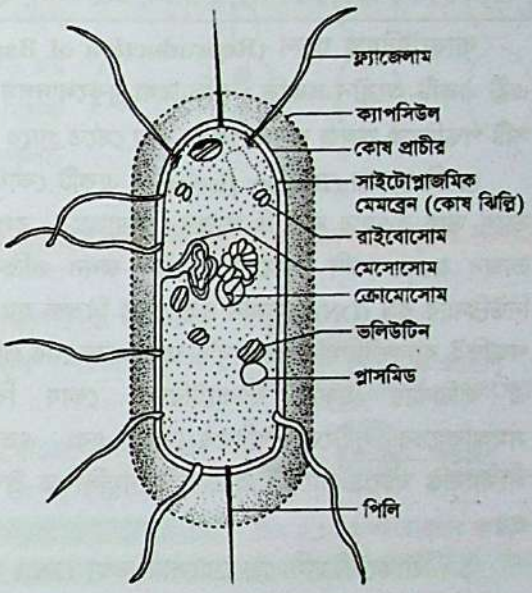

চিত্র ৪.৯ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ (আংশিক ছেদিত দৃশ্য)।

৫। **প্লাজমামেমব্রেন** : সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। এটি সরল শৃঙ্খলের ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হিসেবে অবস্থিত, এর সাথে মাঝে মাঝে প্রোটিন থাকে। এতে কোলেস্টেরল থাকে না। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন অনেক মেটাবলিক কাজ করে থাকে। বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন বহু শ্বসনিক ও ফসফোরাইলেটিক এনজাইম ধারণ করে (মাইটোকন্ড্রিয়ার অনুরূপ)। ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাইলাকয়েড সদৃশ গঠন সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়াতে মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, তবুও কিছু ATP তৈরি হয় সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায়, কারণ ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেনে ফসফোরাইলেটিক এনজাইম থাকে।

৬। **মেসোসোম** : ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে মেসোসোম বলে। অনেকের মতে মেসোসোম কোষ বিভাজনে সাহায্য করে থাকে।

৭। **সাইটোপ্লাজম** : সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ (লৌহ, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি)। গহ্বরগুলো কোষরস দিয়ে পূর্ণ থাকে। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণু হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্রোম্যাটোফোর থাকে। তরুণ ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে **ভলিউটিন** থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এসব দানা কোষ গহ্বরে স্থানান্তরিত হয়।

৮। **ক্রোমোসোম** : কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু। এটি কার্যত বৃত্তাকার এবং নগ্ন অর্থাৎ এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন প্রোটিন থাকে না। ক্রোমোসোমকে ঘিরে কোনো নিউক্লিয়ার আবরণ থাকে না। সাইটোপ্লাজমস্থ DNA সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিউক্লিয়য়েড (nucleoid) বলে।

৯। **প্লাসমিড** : বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকায় ও প্রকৃত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যাকে বলা হয় প্লাসমিড। প্লাসমিড স্ববিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এতে স্বল্প সংখ্যক জিন থাকে। ভেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**কাজ :** একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ অঙ্কন কর এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
**উপকরণ :** পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি।

**ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria) :** ব্যাকটেরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হলো দ্বি-ভাজন পদ্ধতি। এটি একটি অযৌন পদ্ধতি। কুঁড়ি তথা মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে পারে। কুঁড়ি সৃষ্টি পদ্ধতিকে অঙ্গজ জনন পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

□ **দ্বি-ভাজন (Binary fission) :** একটি কোষ সমান দুই ভাগে ভাগ হওয়ার নাম দ্বি-ভাজন। অন্যভাবে বলা যায় দ্বি-ভাজন হলো আদি কোষের অযৌন জনন প্রক্রিয়া যেখানে নিউক্লিয়ার বস্তু (DNA) সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বি-ভাজন পদ্ধতিই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি তথা প্রজননের প্রধান উপায়। এ প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ বিভক্ত হয়ে সমআকারের দুটিতে পরিণত হয় এবং এভাবেই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হয়।

১। ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম তথা DNA ব্যাকটেরিয়া কোষের দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থান নেয় এবং প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত হয়।

২। প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় DNA-অণুর প্রতিলিপন হয়।

৩। এ অবস্থায় কোষটি লম্বায় বৃদ্ধি পায়। কোষপ্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেনের বৃদ্ধি কোষের দুই প্রান্তের মাঝখানে ঘটে থাকে।

৪। কোষপ্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন লম্বায় বৃদ্ধির কারণে DNA রেপ্লিকা দুটি দুই দিকে পৃথক হয়ে যায়।

৫। লম্বায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষের মাঝখানে প্লাজমামেমব্রেন ক্রমশ ভেতরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং একই সাথে ঐ অংশে কোষপ্রাচীর সংশ্লেষিত হতে থাকে। এক সময় একটি কোষ দুটি কোষে পরিণত হয়।

৬। শেষ পর্যায়ে টার্গার প্রেসারের কারণে নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষ দুটি পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায়।

৭। পৃথক অপত্য কোষ দুটি বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের সমান আকারের হয় এবং পুনরায় দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

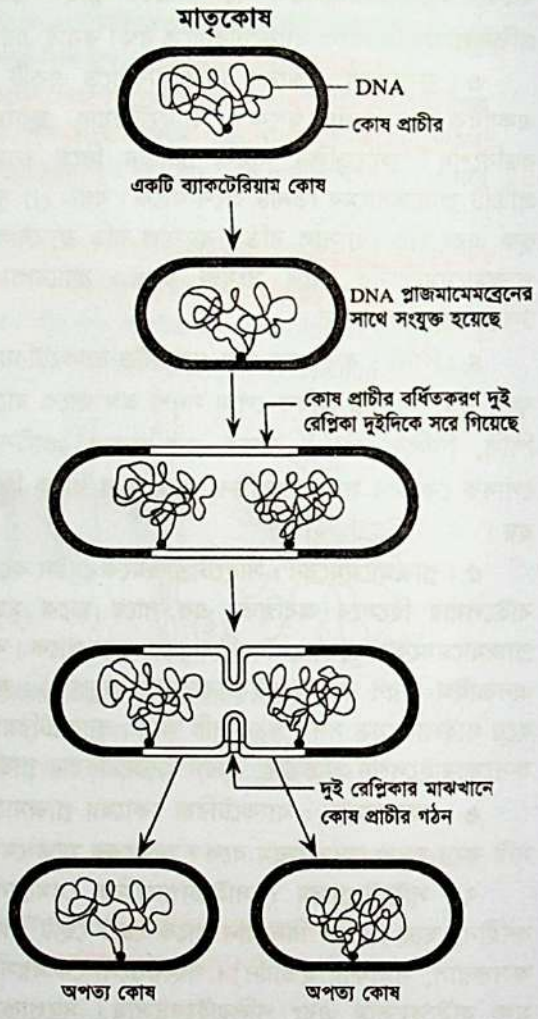


চিত্র ৪.১০ : দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি।

পরিবেশ উপযুক্ত হলে আমাদের অন্ত্রের *E. coli* ব্যাকটেরিয়া প্রতি বিশ মিনিটে সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এক দিনে *E. coli*-এর ৭২টি জেনারেশন সৃষ্টি হতে পারে (৪.৭ সেক্সট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, যার ওজন এক লক্ষ পাউন্ড)। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, কারণ কয়েক জেনারেশন বৃদ্ধির পরই এদের খাবার ঘাটতি দেখা দেয় এবং এদের বর্জ্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে ফেলে, তাই দ্বিভাজন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে পোষক দেহের ইমিউন সিস্টেম দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার অব্যাহত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রয়োগকৃত ওষুধও দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারে, ফলে রোগ আরোগ্য হয়।

**কাজ :** মাতৃকোষ থেকে নতুন দুটি কোষ সৃষ্টির ধাপসমূহ নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অনুকূল পরিবেশে মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে।

❐ **মুকুলোদগম (Budding) :** (i) কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে মুকুলোদগম তথা কুঁড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে এক পাশে একটি ছোট কুঁড়ি বের হয়। (ii) পরে একদিকে কুড়িটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং অপর দিকে মূল ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়য়েড বস্তুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। (iii) নিউক্লিয়য়েড বস্তুর একটি খণ্ড মুকুলে প্রবেশ করে। (iv) মুকুলটি মাতৃকোষের প্রায় সমান হলে পৃথক হয়ে যায়।

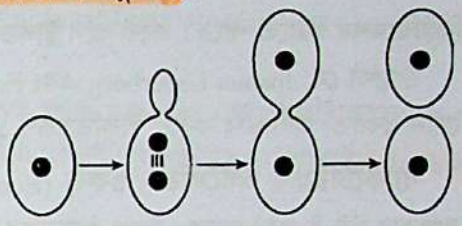

চিত্র ৪.১১ : ব্যাকটেরিয়ার মুকুলোদগম

❐ **অযৌন জনন (Asexual reproduction) :** প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া গনিডিয়া বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতিকে অযৌন জনন পদ্ধতি বলা হয়।

**(i) গনিডিয়া :** *Leucothris* জাতীয় সূত্রাকার ব্যাকটেরিয়ার অগ্রভাগ হতে গনিডিয়া নামক অযৌন একক সৃষ্টি হয় যা একসময় পৃথক হয়ে যায় এবং অনুকূল পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**(ii) এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু উৎপাদন :** সাধারণত Bacillaceae গোত্রের ব্যাকটেরিয়া অন্তরেণু উৎপন্ন করে থাকে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম হতে একটি অন্তরেণু উৎপন্ন হয় তাই এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে না, প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মাত্র। অন্তরেণু গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং অত্যন্ত পুরু প্রাচীরে আবৃত থাকে। অনুকূল পরিবেশে অন্তরেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি মাত্র ব্যাক্টেরিয়া কোষ সৃষ্টি করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জনন প্রক্রিয়া নয়।

চিত্র ৪.১২ ঃ ব্যাক্টেরিয়ার অন্তরেণু

❐ **যৌন জনন (Sexual reproduction) :** প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াতে কোনো যৌন জনন ঘটে না। এখানে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না, কোনো মায়োসিস বিভাজন হয় না, কোনো ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় না, কোনো জাইগোটও তৈরি হয় না। তবে বংশগতীয় বস্তু (genetic material) স্থানান্তর হয়। বংশগতীয় বস্তু (ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম বা DNA) তিনভাগে স্থানান্তরিত হতে পারে।

**(i) কনজুগেশন নালিপথে :** একটি দাতা কোষ ও একটি গ্রহীতা কোষের মধ্যে একটি ফাঁপা নলের মতো কনজুগেশন নালি সৃষ্টি হয়। এই নালিপথে দাতা কোষ থেকে সাধারণত প্লাসমিড গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্লাসমিড অনুলিপিত হয়, একটি দাতা কোষ থেকে যায়, অপরটি নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। **বহু ব্যাকটেরিয়া এভাবে প্রচলিত ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।**

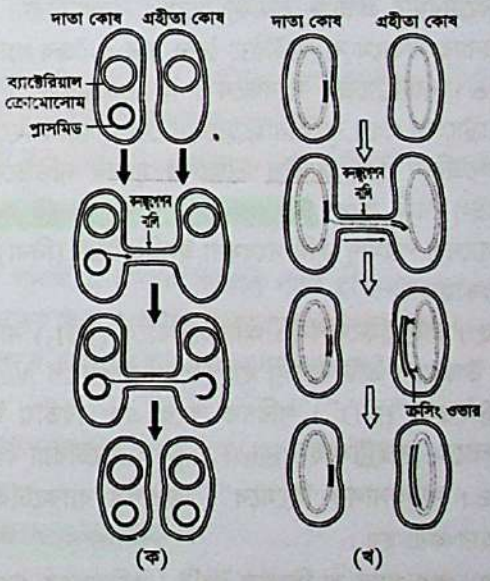


চিত্র ৪.১৩ : ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় বস্তুর স্থানান্তর (ক) প্লাসমিড স্থানান্তর, (খ) মূল ক্রোমোসোমের আংশিক স্থানান্তর ও রিকম্বিনেশন

অতি বিরল ক্ষেত্রে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমও এই নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হতে পারে। সাধারণত ক্রোমোসোমের কিয়দংশ গ্রহীতা কোষে প্রবেশের পর নালির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রহীতা কোষের ক্রোমোসোমের সাথে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমের রিকম্বিনেশন ঘটে। অতিরিক্ত অংশ বিগলিত হয়ে যায়। গবেষণাগারে এটা ঘটানো সম্ভব হলেও প্রকৃতিতে খুবই কম ঘটে থাকে।

(ii) পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার (সাধারণত মৃত ব্যাকটেরিয়ার) DNA গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে ট্রান্সফরমেশন (Transformation)।

(iii) ফায ভাইরাসের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়ার জিনোম, কখনও ফায জিনোম, অন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে ট্রান্সডাকশন (Transduction)।

উল্লেখ্য যে, Joshua Lederberg এবং Edward Tatum বিজ্ঞানীদ্বয় 1958 সালে *Escherichia coli* নামক ব্যাক্টেরিয়ার যৌন প্রবণতা আবিষ্কার করার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

**ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Bacteria) :** ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার এবং অপকার দুই-ই করে থাকে। উভয় গুণাবলির জন্য ব্যাকটেরিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

## ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

**(ক) চিকিৎসা ক্ষেত্রে :**

**১। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে :** ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন (*Bacillus subtilis* হতে), পলিমিক্সিন (*Bacillus polymyxa* হতে) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

**২। প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে :** ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি. (ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুস্টংকার) রোগের টিকা বা প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। *Corynebacterium diptheriae* (D), *Bordetella pertussis* (P) এবং *Clostridium tetani* (T) হতে **DPT** (D= Diphtheria, P= Pertussis, T= Tetanus) নামকরণ করা হয়েছে।

**(খ) কৃষি ক্ষেত্রে :**

**৩। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে :** মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার অবদান অনেক। মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয়ে ব্যাকটেরিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। ব্যাকটেরিয়া মাটির উপাদান হিসেবেও কাজ করে। নানাবিধ আবর্জনা হতে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার ও জৈব গ্যাস প্রস্তুত করে থাকে।

**৪। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে :** *Azotobacter, Pseudomonas, Clostridium* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগ পদার্থ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া সিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে থাকে। বাংলাদেশে মসুর ডালের মূলে নডিউল তৈরি করে *Rhizobium* গণের তিনটি প্রজাতি। এগুলো হলো *R. bangladeshense, R. bine* এবং *R. lentis*। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর তরুণ বিজ্ঞানী ড. মো: হারুন-অর রশিদ এই নতুন ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কারক।

**৫। নাইট্রিফিকেশন :** অ্যামোনিয়াকে ($NH_3$) নাইট্রেট-এ ($NO_3^-$) পরিণত করাকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশন। সাধারণত দুটি উপধাপে এটি সম্পন্ন হয়। প্রথম উপধাপে *Nitrosomonas, Nitrococcus* ইত্যাদি স্থলজ ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইড-এ ($NO_2^-$) পরিণত করে এবং দ্বিতীয় উপধাপে *Nitrobacter* নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে ($NO_3^-$) পরিণত করে। এদেরকে নাইট্রিফাইং (nitrifying) ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। [$NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$]

**৬। পতঙ্গনাশক হিসেবে :** কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus thuringiensis*) বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

**৭। পশু খাদ্য বা সিলেজ তৈরি :** কৃষিক্ষেত্রে এবং দুগ্ধ শিল্পে পশুর অবদান উল্লেখযোগ্য। পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খড় জাতীয় পদার্থকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পানি মিশ্রিত করে *Lactobacillus* sp. এর কার্যকারিতায় পশুখাদ্য বা সিলেজ তৈরি হয়। Yest মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে গাভীর দুধের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

**৮। ফলন বৃদ্ধিতে :** কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং গমের উৎপাদন শতকরা ২০৮ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

**(গ) শিল্প ক্ষেত্রে :**

**৯। চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে :** চা, কফি, তামাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াজাতকরণে *Bacillus megaterium* নামক ব্যাকটেরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০। **দুগ্ধজাত শিল্পে :** *Streptococcus lactis, Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুগ্ধ হতে মাখন, দই, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

১১। **পাট শিল্পে :** ব্যাকটেরিয়ার পচনক্রিয়ার ফলেই পাটের আঁশগুলো পৃথক হয়ে যায় এবং আমরা সহজেই পাটের কাণ্ড থেকে আঁশ ছাড়াতে পারি। কাজেই আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা তুলনাহীন। এ ব্যাপারে *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট।

১২। **চামড়া শিল্পে :** চামড়া হতে লোম ছাড়ানোর ব্যাপারে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে *Bacillus* এর বিভিন্ন প্রজাতি চামড়ার লোম ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৩। **বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস তৈরিতে :** জৈব গ্যাস তৈরিতে এবং হেভী মেটাল (ভারী ধাতু) পৃথকীকরণেও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪। **টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতিতে :** টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করতে এ সল্ট ব্যবহৃত হয়।

১৫। **রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকরণে :** ভিনেগার (*Acetobacter xylinum* দিয়ে), ল্যাকটিক অ্যাসিড (*Bacillus lacticacidi* দিয়ে), অ্যাসিটোন (*Clostridium acetobutylicum* দিয়ে) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের জন্য শিল্পক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

**(ঘ) মানব জীবনে :**

১৬। **সেলুলোজ হজমে :** গবাদি পশু ঘাস, খড় প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই পশুপালন সহজ হয়।

১৭। **ভিটামিন তৈরিতে :** মানুষের অন্ত্রের *Escherichia coli (E. coli)* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটমিন-বি$_{১২}$, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

১৮। **জিন প্রকৌশলে :** জিন প্রকৌশলে অনেক ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli, Agrobacterium* প্রভৃতি) বাহক হিসেবে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

**(ঙ) পরিবেশ উন্নয়নে :**

১৯। **আবর্জনা পচনে :** উদ্ভিদ ও প্রাণীর যাবতীয় মৃতদেহ, বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য জঞ্জাল পচন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বের জন্য ব্যাক্টেরিয়াকে 'প্রকৃতির ঝাড়ুদার' বলে।

২০। **পয়ঃনিষ্কাশনে :** জৈব বর্জ্য পদার্থকে দ্রুত রূপান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া পয়ঃপ্রণালিকে সুষ্ঠু ও চালু রাখে; যেমন–*Zooglea ramigera*।

২১। **তেল অপসারণে :** সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল-খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়; যেমন–*Pseudomonas aeruginosa*।

২২। **বায়োগ্যাস উৎপাদন :** *Bacillus, E. coli, Clostridium, Methanococcus*।

## ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা

১। **মানুষের রোগ সৃষ্টি :** মানুষের অধিকাংশ মারাত্মক রোগগুলোই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। মানুষের যক্ষ্মা (*Mycobacterium tuberculosis* দিয়ে), নিউমোনিয়া (*Diplococcus pneumoniae* দিয়ে), টাইফয়েড (*Salmonella typhi* দিয়ে), কলেরা (*Vibrio cholerae* দিয়ে), ডিপথেরিয়া (*Corynebacterium diptheriae* দিয়ে), আমাশয় (*Bacillus dysenteri* দিয়ে), ধনুস্টংকার বা টিটেনাস (*Clostridium tetani* দিয়ে), হুপিংকাশি (*Bordetella pertussis* দিয়ে) ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। এ ছাড়াও এনথ্রাক্স, মেনিনজাইটিস, লেপরসি (কুষ্ঠ রোগ), আনডিউলেটেড ফিভার ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

**যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Diseases = STD) :** যেসব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগকে যৌনবাহিত রোগ বলে। যেমন- গনোরিয়া ও

সিফিলিস। *Neisseria gonorrhoeae* প্রজাতিভুক্ত ব্যাক্টেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে গনোরিয়া (Gonorrhea) বলে। গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। *Treponema pallidum* নামক ব্যাক্টেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে সিফিলিস (Syphilis) বলে। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মৃত্যুও হতে পারে।

**২। অন্যান্য প্রাণীর রোগ সৃষ্টি :** গরু-মহিষের যক্ষা (*Mycobacterium bovis*), আনডিউলেটেড ফিভার , ভেড়ার এনথ্রাক্স (*Bacillus anthracis*), ইঁদুরের প্লেগ, হাঁস-মুরগির কলেরা (*Bacillus avisepticus*), গলাফোলা রোগ (*Pasteurella multocida*) ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

**৩। উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি :** বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদের অনেক রোগ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। এতে ফসলের ফলন অনেক কমে যায়। গমের টুন্ডুরোগ (*Agrobacterium tritici* দিয়ে), ধানের পাতা ধ্বসা (leaf blight) রোগ (*Xanthomonas oryzae* দিয়ে), আখের আঠাঝরা রোগ (*Xanthomonas vasculorum* দিয়ে) ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া লেবুর ক্যাংকার (*Xanthomonas citri*), আলুর স্ক্যাব (*Streptomyces scabies*), টমেটোর ক্যাঙ্কার *Corynebacterium michiganese),* আপেলের ফায়ার ব্লাইট (*Erwinia amylovora*), তামাকের ব্লাইট (*Pseudomonas tabacci*), শিমের লিফ স্পট (*Xanthomonas malvacearum)* রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়।

**৪। খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিষাক্তকরণ :** ব্যাকটেরিয়া নানা রকম টাটকা ও সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে পচন ঘটিয়ে আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। *Clostridium botulinum* নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে **botulin** নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে যাকে বটুলিজম (botulism) বলে।

**৫। পানি দূষণ :** কলিফরম ব্যাকটেরিয়া (সাধারণত মল দিয়ে দূষিত) পানিকে পানের অযোগ্য করে।

**৬। মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্টকরণ :** নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কিন্তু কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus denitrificans*) নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় মাটিস্থ নাইট্রেটকে ভেঙে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।

**৭। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষতি সাধন :** ব্যাকটেরিয়া কাপড়-চোপড়, লোহা, কাঠের আসবাবপত্রসহ অনেক দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন-*Desulfovibrio* sp. লোহার পাইপে ক্ষতের সৃষ্টি করে পানি সরবরাহে বিঘ্ন।

**৮। বায়োটেরোরিজম বা জৈব সন্ত্রাস :** ক্ষতিকারক জীবাণুকে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে বায়োটেরোরিজম বলে।

**৯। যানবাহনের দুর্ঘটনা :** *Clostridium* sp. বিমানের জ্বালানিতে জন্মালে বিমান দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

### ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য

| পার্থক্যের বিষয় | ভাইরাস | ব্যাকটেরিয়া |
|---|---|---|
| ১। আকৃতি | এরা অকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই। | এরা কোষীয়। আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে। |
| ২। আকার | এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার। | এরা আণুবীক্ষণিক, ০.২ হতে ৫.০ মাইক্রোমিটার। |
| ৩। বংশবৃদ্ধি | সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। | সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। |
| ৪। কেলাসিতকরণ (তরল দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা) | কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে। | কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না। |
| ৫। ক্ষুদ্রাঙ্গের উপস্থিতি | এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই এবং বিপাক ক্রিয়াও দেখা যায় না। | এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে এবং বিপাক ক্রিয়া ঘটে। |
| ৬। নিউক্লিক অ্যাসিডের অবস্থান | ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে। | ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। |
| ৭। নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতি | কোষে DNA বা RNA যে কোনো একপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। | কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। |
| ৮। এনজাইমের উপস্থিতি | এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না। | এদের দেহে এনজাইম থাকে। |

## ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মানুষ, পশু এবং গাছপালার অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতিপয় রোগ ফসল ও মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে, দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্ভিদে সাধারণত ব্লাইট, উইল্ট, গল ও রট (blight, wilt, gall, rot) রোগ হয়ে থাকে। এখানে ব্যাকটেরিয়াজনিত ধানের ব্লাইট রোগ এবং মানুষের কলেরা রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

**ব্লাইট (Blight) :** গাছের ফুল, পাতা ও কাণ্ডের টিস্যুর ক্ষয়প্রাপ্তি (মরে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া) হওয়াকে ব্লাইট বলা হয়। এখানে ধান গাছের ব্লাইট (ধ্বসা) রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**(ক) ধান গাছের ব্লাইট রোগ (Blight disease of rice) :** ধানের মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপীই এর বিস্তৃতি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণটি (strain) শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। জাপানের কৃষকেরা সর্বপ্রথম এ রোগের সন্ধান পান বলে ধারণা করা হয়। Takaeshi ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়।

**রোগজীবাণু (Pathogen/Causal organism) :** ধান গাছের ব্যাকটেরিয়্যাল ব্লাইট নামক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishsyama) Swings *et al.* এটি দণ্ডাকৃতির, ১.২ × ০.৩ - ০.৫ µm, অপেক্ষাকৃত মোটা ও খাটো। এরা সাধারণত এককভাবে থাকে, কখনো দুটি এক সাথে থাকতে পারে, তবে চেইন সৃষ্টি করে না। এরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং স্পোর তৈরি করে না। এদের কোনো ক্যাপসিউল নেই, তবে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। অ্যাগার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, মসৃণ, মোমের ন্যায় হলুদাভ ও চকচকে কলোনি উৎপন্ন করে। এরা বিভিন্ন ঘাস (*Leersia oryzoides., Leptochloa dubia. Cyperus rotundus, C. difformis*) ও বন্য ধানকে (*Oryza rufipogon, O. australiensis*) বিকল্প পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

**রোগাক্রমণ (Infection) :** একাধিক উৎস থেকে রোগাক্রমণ ঘটতে পারে, যেমন- রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড় জমিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। পাতার ক্ষত স্থান, কাটা স্থান (লাগানোর আগে অনেক সময় চারার লম্বা পাতার আগা কেটে দেয়া হয়), হাইডাথোড বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে জীবাণু গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। পরে জীবাণু শিরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছ নেতিয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা (২৫–৩০° সে.), উচ্চ জলীয় বাষ্প, বৃষ্টি, জমিতে অধিক পানি রোগাক্রমণে সহায়তা করে। অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগও রোগ বিস্তারের অনুকূল হয়। ঝড়ো বাতাস পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে, আর ঐ ক্ষত স্থান দিয়ে রোগজীবাণু ভেতরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে।

**রোগ লক্ষণ (Sign and Symptoms) :** সাধারণত রোগ লক্ষণ পাতায়ই সীমিত থাকে। লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

১। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়।

২। পাতায় ভেজা (Water-soaked), অর্ধস্বচ্ছ ও লম্বা লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগ পাতার শীর্ষে শুরু হয়।

৩। দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় হতে থাকে এবং ঢেউ খেলানো প্রান্ত বিশিষ্ট হয়।

৪। দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা ধূসর বর্ণের হয়।

৫। সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।

৬। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।

৭। আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মরে যায়।

৮। লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।

৯। ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

১০। ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।

১১। আক্রান্ত গাছের অধিকাংশ ধান চিটায় পরিণত হয়।

**রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ**

১। সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা।
২। বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।
৩। কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
৪। জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে।
৫। বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে, অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।
৬। বীজ বুনা বা চারা লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে, পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৭। রোপণের সময় চারাগাছের পাতা ছাঁটাই করা যাবে না।
৮। নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।
৯। গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
১০। ফিনাইল সারফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
১১। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

**(খ) কলেরা (Cholera)**

**রোগজীবাণু :** *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি একটু বাঁকা, কমার মতো। এর দৈর্ঘ্য ১-৫ মাইক্রন এবং প্রস্থ ০.৪-০.৬ মাইক্রন। এর একপ্রান্তে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। কলেরা একটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। রবার্ট কচ সর্বপ্রথম কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কলেরা রোগের জীবাণু দেহে ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাসের সাথে লেগে যায় এবং কলেরাজেন (Choleragen) নামক টক্সিন মিশ্রিত করে। কলেরাজেন একটি এন্টারোটক্সিন। বিভিন্ন কলেরার মধ্যে এশিয়াটিক কলেরা সবচেয়ে মারাত্মক।

**রোগ লক্ষণ :** কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ হলো প্রবল উদরাময় (ডায়রিয়া)। পায়খানার প্রথম দিকে মল থাকে, পরে চালধোয়া পানির মতো নির্গত হয়। রোগীর দেহে জ্বর থাকে এবং বমি হতে পারে। নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ হয়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রক্ত প্রবাহ কমে মস্তিষ্কে $O_2$ এর ঘাটতি দেখা দেয় ও রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। দেহে মাংসপেশীর সংকোচন (cramp) এ রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। বমি এবং ঘন ঘন পানির ন্যায় পায়খানার ফলে রোগীর দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে, একই কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা, খিঁচুনি দেখা দেয়, রক্তচাপ কমে যায়, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রোগের প্রচণ্ডতায় রোগীর চোখ বসে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়ে যায়। চামড়া কুঁচকে যায়। ব্যাপক পরিমাণে শরীর থেকে পানি ও ইলেকট্রোলাইট হারানোর ফলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগী মারা যেতে পারে। এছাড়া রক্ত সংবহনতন্ত্র অচল হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

**প্রতিকার :** কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পানি ও লবণ সমন্বয়ের জন্য শিরায় সেলাইন দেয়া হলো উত্তম চিকিৎসা। সাথে ডাবের পানি ও খাবার সেলাইন ORS (Oral Rehydration Saline) দেয়া যেতে পারে। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। মোট কথা রোগীর দেহে যেন পানিশূন্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

**প্রতিরোধ :** কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ, তাই বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা করতে হবে। দূষিত পানি, বাসি খাবার, রাস্তার উন্মুক্ত খাবার ও পানীয় বর্জন করতে হবে। রোগীর ভেদ-বমি থেকে মাছির সাহায্যে গৌণ সংক্রমণ ঘটে, তাই খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। রোগীর পরিধেয় কাপড়, বিছানা-পত্র পুকুর বা নদী নালায় না ধুয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকাতে হবে। সম্ভব হলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। কোনো এলাকায় কলেরা দেখা দিলে সবার কলেরা ভেকসিন (টিকা) নিতে হবে। কলেরা রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের পানি ও কলেরা সেলাইন খাওয়াতে হবে যাতে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতি দ্রুত পূরণ হয়।

**ব্যবহারিক : টক দই থেকে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্কন।**

**তত্ত্ব :** কতিপয় ব্যাকটেরিয়ার জৈব ক্রিয়াকলাপের ফলে দুধ, দই-এ পরিণত হয়, তাই দই-এ প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

**উপকরণ :** কিছু পরিমাণ টক দই সাসপেনশন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, কাচের পরিষ্কার শুকনো স্লাইড, পাতিত পানি (পরিস্রুত পানি), ড্রপার, নিডল, তুলি, স্যাফ্রানিন রং, স্পিরিট ল্যাম্প, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, একটি টেস্টটিউব।

**কার্যপদ্ধতি :** ১। প্রথমে একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে সামান্য পরিমাণ টক দই নিতে হবে এবং তাতে পরিমাণ মতো পরিস্রুত পানি মিশিয়ে ভালোভাবে কিছুক্ষণ ঝাঁকাতে হবে।

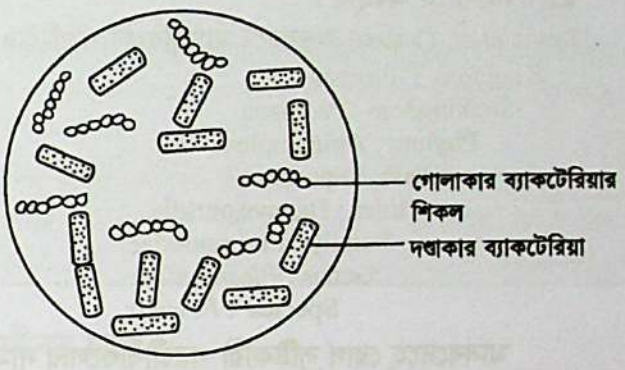

চিত্র ৪.১৪ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট টক দই-এ ব্যাকটেরিয়া।

২। এবার ফ্লাস্কটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রেখে হালকা গরম করতে হবে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য ১০-১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। ১০-১৫ মিনিট পর দেখা যাবে দই-এর ঘন অংশ তলানি হিসেবে নিচে জমা হয়েছে আর জলীয় অংশ ওপরে রয়েছে। জলীয় অংশটুকু একটি টেস্টটিউবে ঢেলে নিতে হবে। এই জলীয় অংশই ব্যাকটেরিয়ার নমুনা।

৩। টেস্টটিউব থেকে ড্রপার দিয়ে এক ড্রপ নমুনা একটি পরিষ্কার স্লাইডের মাঝখানে রাখতে হবে এবং নিডলের সাহায্যে তরল নমুনাটুকু স্লাইডে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৪। নমুনাটুকু বাতাসে শুকিয়ে গেলে স্লাইডকে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনের ওপর দিয়ে কয়েকবার আনা-নেওয়া করলে নমুনার আস্তরটি স্লাইডের সাথে ভালোভাবে লেগে যাবে।

৫। এবার স্লাইডের ওপর শুকনা নমুনাতে স্যাফ্রানিন দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং ২/৩ মিনিট পর হালকা করে পরিষ্কার পানি ঢেলে দিলে অতিরিক্ত রং পানির সাথে চলে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে স্লাইডটি শুকিয়ে যাবে। স্লাইডটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

**পর্যবেক্ষণ :** স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অবজেকটিভ-এর নিচে রেখে নিরীক্ষণ করলে লাল রং-এ রঞ্জিত দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষুদ্র পুঁতির মালার মতো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া দেখা যাবে।

**সিদ্ধান্ত :** সরবরাহকৃত টক দই-এ গোলাকার *(Streptococcus)* ও দণ্ডাকার *(Lactobacillus)* ব্যাকটেরিয়া থাকে। (টক দই-এর ব্যাকটেরিয়া মানুষের জন্য উপকারী, অপকারী নয়। কাজেই টক দই খেতে অসুবিধা নেই।)

**অঙ্কন :** অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা দৃশ্যটি ব্যবহারিক খাতায় যথাযথভাবে আঁকতে হবে।

## ম্যালেরিয়া পরজীবী (Malarial Parasite)

ম্যালেরিয়া বিশ্বের প্রাচীনতম রোগগুলোর অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের শুরুতে চীন দেশে এটি **'অনুপম পর্যাবৃত জ্বর'** (unique periodic fever) হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য এ রোগের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে একে **'রোমান জ্বর'** বলা হতো। মধ্যযুগে একে **'জলা জ্বর'** (marsh fever) বলা হতো। **"Malaria"** শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী **Torti** (1753)। দুটি ইতালিয় শব্দ *Mal* (অর্থ-দূষিত) ও *aria* (অর্থ-বায়ু) হতে Malaria শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, যার আভিধানিক অর্থ দূষিত বায়ু। তখনকার দিনে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে "দূষিত বায়ু সেবনে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়।" ফরাসি ডাক্তার **Charles Laveron** (1880) ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত রক্ত কণিকা থেকে ম্যালেরিয়ার পরজীবী আবিষ্কার করলে প্রায় শতবছরের এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। এজন্য তাঁকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কর্মরত বৃটিশ সেনাবাহিনীর ডাক্তার **Sir Ronald Ross** আবিষ্কার করেন যে *Anopheles* গণভুক্ত মশকীরা এ রোগের জীবাণু একদেহ হতে অন্যদেহে বিস্তার ঘটায়। এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাকে ১৯০২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মূলত: ম্যালেরিয়া হচ্ছে *Anopheles* মশকীবাহিত (মশা নয়) এক ধরনের জ্বররোগ। এ রোগে রক্তের লোহিত কণিব

ধ্বংস হয়, তাই রক্তস্বল্পতাসহ (anaemia) বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। *Plasmodium* গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীতে এ রোগ সৃষ্টি করে। মানবদেহে এ পর্যন্ত রোগ সৃষ্টিকারী ৪টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

**শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :**

Levin *et al.* (১৯৮০) অনুসরণে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

Kingdom : Protista
Subkingdom : Protozoa
Phylum : Apicomplexa
Class : Sporozoa
Order : Haemosporidia
Family : Plasmodiidae
Genus : *Plasmodium*
Species : *P. vivax*

**মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীগুলোর নাম, সৃষ্ট রোগের নাম ও জ্বরের প্রকৃতি নিম্নরূপ :**

| ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নাম | রোগের নাম | জ্বরের প্রকৃতি |
|---|---|---|
| ১. *Plasmodium vivax* | বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া | 48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে |
| ২. *Plasmodium malariae* | কোয়ারটার্ন ম্যালেরিয়া | 72 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে |
| ৩. *Plasmodium ovale* | মৃদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া | 48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে |
| ৪. *Plasmodium falciparum* | ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া | 36–48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে |

## জীবন চক্র (Life Cycle)

কোন জীব তার অনুরূপ সৃষ্টি করতে যে সকল ধাপসমূহ অতিক্রম করে, তাদের সমষ্টিকে জীবন চক্র বলে। *Plasmodium vivax* এর জীবন চক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়, যথা-মানুষ ও মশকী। প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী মানুষ ম্যালেরিয়া পরজীবীর মাধ্যমিক (intermediate) বা গৌণ (secondary) পোষক (host), কারণ মানবদেহে এ পরজীবীর যৌন জনন হয় না। অপরদিকে মশকী এ পরজীবীর নির্দিষ্ট (definite) বা মুখ্য (primary) পোষক, কারণ মশকীর দেহে এ পরজীবীর যৌন পরিপক্বতা তৈরি হয় ও যৌন জনন সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রোটোজোয়া–পতঙ্গ–মেরুদণ্ডী সম্পর্কিত পরজীবী পোষক চক্রে প্রজননের গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পোষক নির্ধারণ করা হয়। তাই মানুষকে এ পরজীবীর মুখ্য পোষক ও মশকীকে গৌণ পোষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

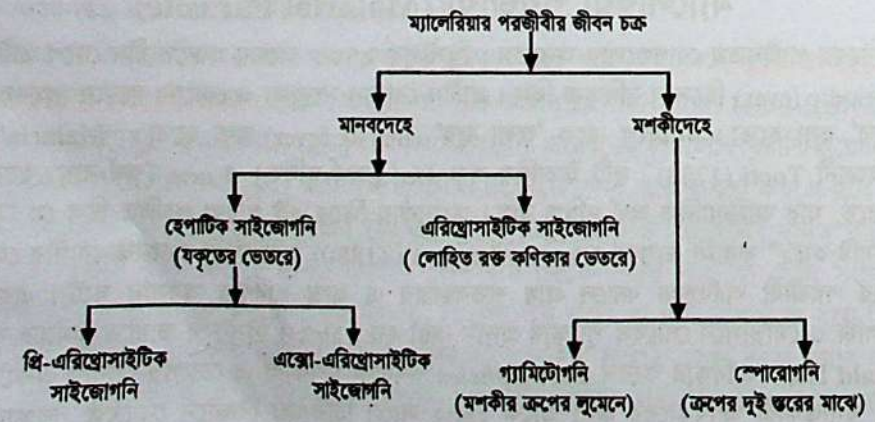

[বি. দ্র. (i) দুটি পোষক কেন প্রয়োজন?-নিম্নশ্রেণির জীবেরা বার বার অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের কারণে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাই তারা মাঝে মাঝে যৌন জননে আবদ্ধ হয়ে জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। এটি নিম্নশ্রেণির জীবদের Evolutionary অভিযোজন। *Plasmodium* এর জীবনেও এমনটি ঘটেছে। তাই তারা একটি পোষকের মাধ্যমে (যেহেতু যৌন জনন মশকীতে ও অযৌন জনন মানবদেহে) জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

(ii) কেবলমাত্র স্ত্রী *Anopheles* ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় কেন? স্ত্রী মশকীর ডিম্বাণুর পরিস্ফুটনের জন্য উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর রক্ত প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র মশকীরাই (মশা নয়) রক্ত পান করে এবং জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। পুরুষ মশারা ফুলের মধু বা অন্যান্য উৎস হতে খাবার সংগ্রহ করে মানুষকে দংশন করে না।

অপরদিকে *Culex* বা *Aedes* প্রভৃতি মশকীর পরিপাকতন্ত্রে বিশেষ ধরনের এনজাইম আছে, যা জীবাণুর গ্যামিটোসাইটগুলোকে নষ্ট করতে সক্ষম। তাই এরা এ জীবাণুর বিস্তার ঘটাতে পারে না। কিন্তু *Anopheles* এর দেহে এরূপ এনজাইম না থাকায় গ্যামিটোসাইটগুলো সক্রিয় থাকে ও রোগের বিস্তার ঘটায়।]

## মানবদেহে জীবন চক্র

মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্ত কণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীবী অযৌন পদ্ধতিতে জীবন চক্র সম্পন্ন করে। এ জীবন চক্রে 'সাইজন্ট' নামক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি বিশেষ দশা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের জীবন চক্রকে সাইজোগনি বলে। মানবদেহে সংঘটিত সাইজোগনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) হেপাটিক সাইজোগনি (Hepatic schizogony) বা যকৃত সাইজোগনি এবং (২) এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Erythrocytic schizogony) বা লোহিত রক্ত কণিকায় সাইজোগনি।

### হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনি

বিজ্ঞানী Shortt এবং Garnham (1948) মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্রের বর্ণনা দেন। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়-(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি, (খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

**(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি (Pre-erythrocytic hepatic schizogony) :**এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ-

১। *Anopheles* মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থিত *Plasmodium*-এর স্পোরোজয়েট (দৈর্ঘ্য 10–14 μm এবং প্রস্থ 0.05–1 μm) দশার পরিণত জীবাণু মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কেমোট্যাক্সিস এর কারণে যকৃতে এসে আশ্রয় নেয়। মানবদেহে প্রবেশের প্রায় ৩০-৪৫ মিনিটের মধ্যে জীবাণুগুলো যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে মাকুআকৃতির স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিপ্টোজয়েটে পরিণত হয়।

৩। প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস (প্রজাতিভেদে প্রায় ১০০০-১২০০) বিশিষ্ট দশায় পরিণত হয়। পরজীবীর এ দশাকে সাইজন্ট বলে।

৪। পরবর্তী পর্যায়ে সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেন সৃষ্টি হয়। পরজীবীর এ দশাকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে।

৫। চক্রের শেষ পর্যায়ে হেপাটোসাইট ভেঙ্গে যায় এবং ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয় এবং এখান থেকে পরবর্তী চক্র শুরু করে।

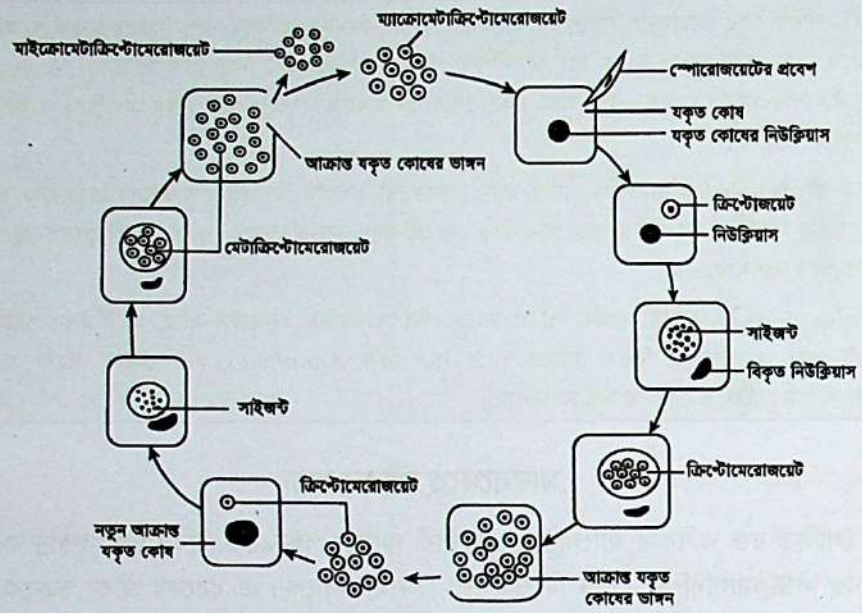


ম্যালেরিয়া পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্র

চিত্র ৪.১৫ : হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনি (duration ৭-১০ দিন)।

**(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি (Exo-erythrocytic hepatic schizogony) :** এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন্ন ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন হেপাটোসাইটকে আক্রমণের মাধ্যমে এ চক্রের সূচনা করে।

**২। সাইজন্ট :** পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বারবার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পরিণত হয়।

**৩। মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট :** সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে যেসব নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাদেরকে মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে।

**৪। আক্রান্ত যকৃত কোষের ভাঙন :** মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো পরিণত হলে আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে এবং নতুন নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এ চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ অবস্থায় মানুষের যকৃতে প্রচুর মেরোজয়েট পাওয়া যায়। আকারের ভিত্তিতে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-(১) মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও (২) ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট। প্রথমোক্তগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং শেষোক্তগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির। বড় আকৃতির মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং ছোট মেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষকে আক্রমণের পরিবর্তে রক্তস্রোতে চলে আসে এবং মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে। স্পোরোজয়েট থেকে এ অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছতে পরজীবীর প্রায় ৭-১০ দিন সময় লাগে। মেরোজয়েটগুলো ম্যালেরিয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করা ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে যকৃত কোষে সাইজোগনি চালিয়ে যেতে পারে।

### এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্ত কণিকায় সংঘটিত সাইজোগনি

প্রি-প্যাটেন্টকাল (রক্তে আত্মপ্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়) অতিক্রমের পর পরজীবী লোহিত রক্ত কণিকাকে (RBC) আক্রমণ করার মাধ্যমে এ চক্রের সূচনা করে।

১। মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষ গহ্বর ও ছোট একটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা।

২। কোষ গহ্বরটি ধীরে ধীরে বড় হয় ও নিউক্লিয়াসটি একপাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং বলা হয়।

৩। প্রায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে পরজীবীর অন্তঃস্থ গহ্বর অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরজীবীটি ক্ষণপদবিশিষ্ট *Amoeba* এর আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাই এ দশাকে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত রক্ত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এ গুলোকে সাফনার্স দানা (কণা) বলে। রক্ত কণিকায় সাফনার্স দানার উপস্থিতি দেখে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।

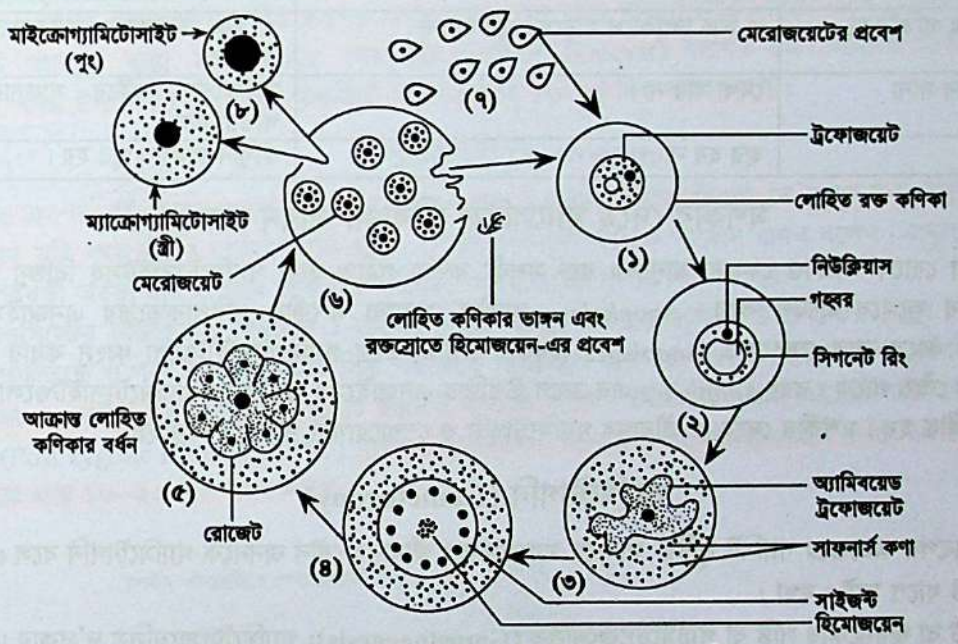


চিত্র ৪.১৬ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি।

৪। অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট দশার কোষস্থ নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ অবস্থাকে সাইজন্ট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।

৫। সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস প্রায় 45 ঘণ্টা পর সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে ১২-১৮টি মেরোজয়েট-এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। এ দশাকে রোজেট বলে।

৬। পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙ্গে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মেরোজয়েট রক্তস্রোতে ঢুকে গেলে রক্তের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এসময় রক্তে প্রচুর পরিমাণে পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই দেহে জ্বর আসে। সমগ্র এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৪৮-৭২ ঘণ্টা সময় লাগে।

৭। মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

৮। কতিপয় মেরোজয়েট গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। গ্যামিটোসাইট দুই প্রকার। পুং গ্যামিটোসাইট বা মাইক্রোগ্যামিটোসাইট এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইট বা ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট। পুং গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে ছোট কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে বড় কিন্তু এর নিউক্লিয়াস ছোট হয়। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটোসাইটগুলো পোষক দেহের প্রান্তীয় রক্তনালীতে অবস্থান করে। মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইটগুলোর আর কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। পরবর্তী ধাপগুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা কেবলমাত্র স্ত্রী *Anopheles* মশকীর দেহেই বিদ্যমান আছে। ৭ দিনের মধ্যে মশকী কর্তৃক শোষিত না হলে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইট ৭ দিনের বেশি বাঁচে না।

**এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক (হেপাটিক) এবং এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মধ্যে পার্থক্য**

| পার্থক্যের বিষয় | হেপাটিক সাইজোগনি | এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি |
|---|---|---|
| ১. কোথায় ঘটে | মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়। | মানুষের লোহিত কণিকায় ঘটে। |
| ২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ | ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ পাওয়া যায়। | ট্রফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখা যায়। |
| ৩. হিমোজয়েন | উৎপন্ন হয় না। | শেষ দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়। |
| ৪. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া | এ চক্র চলাকালে মানুষের জ্বর হয় না। | এ চক্র চলাকালে মানবদেহে কাঁপুনিসহ জ্বর হয়। |
| ৫. সাফনার-এর দানা | দেখা যায় না। | সাইজন্টের বাইরে সাফনার-এর দানা পাওয়া যায়। |
| ৬. জ্বর | জ্বর হয় না। | কাঁপুনিসহকারে জ্বর হয়। |

## মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র

ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কোনো মানুষের রক্ত মশকী কর্তৃক গৃহীত হলে গ্যামিটোসাইটসহ বিভিন্ন দশার জীবাণু মশকীর ক্রপের লুমেনে প্রবেশ করে। *Anopheles* ব্যতীত অন্যান্য মশকীর পরিপাকতন্ত্রের এনজাইম সব দশার জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে ফেললেও, *Anopheles* মশকীর পৌষ্টিকতন্ত্রে গ্যামিটোসাইটগুলো ধ্বংস করার এনজাইম না থাকায় এগুলো বেঁচে থাকে। বরং *Anopheles* এর ক্রপে উপস্থিত এনজাইমের উদ্দীপনায় গ্যামিটোসাইটগুলো পরবর্তী ধাপ শুরু করতে উদ্দীপ্ত হয়। মশকীর দেহে এ জীবাণুর গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি পর্যায় সম্পন্ন হয়।

## গ্যামিটোগনি (Gametogony)

মশকীর ক্রপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন জননকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে ঘটে। যথা :

১। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis): গ্যামিটোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা—

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস এবং (খ) উওজেনেসিস।

**(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis–sperm=শুক্রাণু, gen=গঠন, sis= পদ্ধতি) :** মাইক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণু বা পুংজনন কোষ গঠন প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা :

(i) প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে ৪ – ৮টি ক্ষুদ্রাকার হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণা (৪ – ৮টা) বিশিষ্ট হয়।

(ii) প্রতিটি কোণার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এদেরকে সাইটোপ্লাজমীয় অভিক্ষেপ বলে।

(iii) এর পরপরই জীবাণুর দেহটি কতগুলো ফ্ল্যাজেলা আকৃতির সরু মাকুর মতো মাইক্রোগ্যামিটে বা শুক্রাণুতে পরিণত হয়। [ক্রপের গহ্বরে তাপের তারতম্যের দরুন এই প্রক্রিয়া ঘটে]। ক্রপে গহ্বরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পার্মাটোজেনেসিসের এ বিশেষ প্রক্রিয়াকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন (Exflagellation) বলে।

(iv) মাইক্রোগ্যামিটগুলো প্রথমে একসাথে থাকে, পরে এরা মাতৃকোষ থেকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সাঁতার কাটতে থাকে।

**(খ) উওজেনেসিস (Oogenesis -Oo = ডিম্বাণু , gen = গঠন, sis = পদ্ধতি) :** ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে ম্যাক্রোগ্যামিট বা ডিম্বাণু বা স্ত্রীজননকোষ গঠন প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা–

(i) প্রথমে প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট-এর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় ও একটি করে সক্রিয় গোলাকার ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। এ ছাড়া পোলার বডি নামক আর একটি কোষের আবির্ভাব ঘটলেও শীঘ্রই তা নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) এর পরপরই ম্যাক্রোগ্যামিটের একপ্রান্ত কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলকে নিষেক শঙ্কু/কোন (Fertilization cone) বা অভ্যর্থনা শঙ্কু (Reception cone) বলে। ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস এ শঙ্কুর কাছে অবস্থান করে।

**২। নিষেক ও জাইগোট গঠন (Fertilization and the formation of zygote) :** মুক্ত মাইক্রোগ্যামিটগুলো এরপর পৃথক পৃথকভাবে ম্যাক্রোগ্যামিটের বা ডিম্বাণুর নিষেক শঙ্কুর দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটা ডিম্বাণুতে একটি করে শুক্রাণু প্রবেশ করে এবং নিষেক সম্পন্ন করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু হতে পরে গোলাকার জাইগোট (ডিপ্লয়েড) গঠিত হয়।

**৩। উওকিনেট গঠন :** মশকী রক্ত শোষণের ১২-১৪ ঘণ্টা পর গোল ও নিশ্চল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেট-এ পরিণত হয়। এগুলো লম্বায় ১৮-২৪ মাইক্রোমিটার এবং প্রস্থে ৩-৫ মাইক্রোমিটার। উওকিনেট 24 ঘণ্টার ভেতরেই মশকীর ক্রপের অন্তঃপ্রাচীর ভেদ করে বহিঃপ্রাচীরের নিচে এসে পৌছায় এবং 40 ঘণ্টার মধ্যে সিস্ট আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার উওসিস্টে (Oocyst) পরিণত হয়। আক্রান্ত একটি মশকীর ক্রপে ৫০-৫০০টি পর্যন্ত উওসিস্ট দেখা যায়। উওসিস্ট পরিণত হতে ১০-২০ দিন সময় লাগে।

## স্পোরোগনি (Sporogony)

মশকীর ক্রপের দুই স্তরের মাঝে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় উওসিস্ট দশার জীবাণু যে জননের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট দশার জীবাণু সৃষ্টি করে তাকে স্পোরোগনি বলে। স্পোরোগনিকে অনেকে অযৌন জনন বলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি যৌন জননেরই পরবর্তী অবস্থা যার মাধ্যমে জীবাণুটি সক্রিয় স্পোরোজয়েট দশায় পরিণত হয়।

**১। উওসিস্টের নিউক্লিয়াস বিভাজন :** ক্রপের গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় প্রতিটি উওসিস্টের (2n) নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস পদ্ধতিতে ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। [ক্রপের প্রাচীরে একই সাথে ৫০–৫০০টি উওসিস্ট থাকতে পারে। উওসিস্টের এই মায়োসিসকে পোস্ট জাইগোটিক মায়োসিস (Post zygotic meiosis) বলে।] পরিণত উওসিস্টের আকার প্রথম অবস্থা থেকে ৪–৫ গুণ বড় হয়। উত্তসিস্ট পরিণত হতে প্রায় ১০–২০ দিন সময় লাগে।

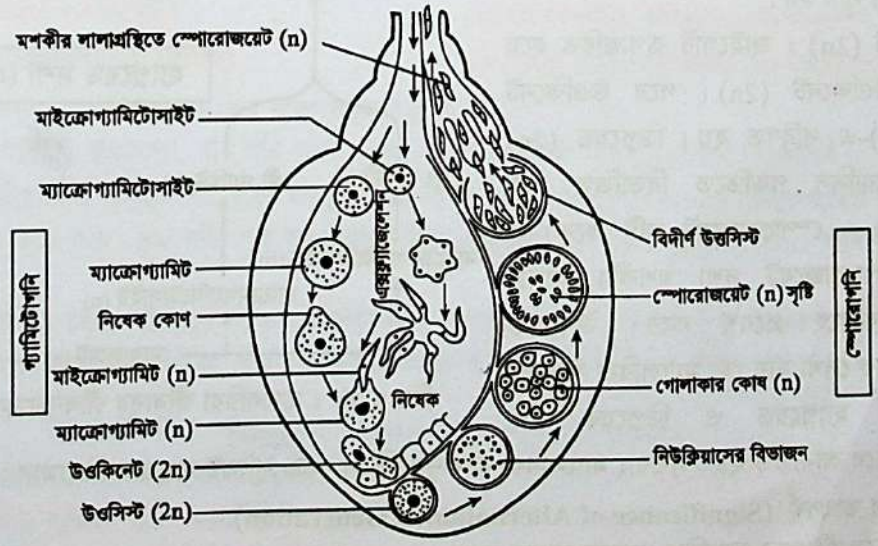


চিত্র ৪.১৭ : মশকীয় দেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন চক্র।

**২। পরিস্ফুটনরত উওসিস্ট :** সিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম জমা হয় ও পরে তার চারদিকে কোষঝিল্লি গঠিত হয়ে বহু সংখ্যক গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়।

**৩। স্পোরোজয়েট গঠন :** এরপর কোষগুলো আকৃতি পরিবর্তন করে মাকু আকৃতির স্পোরোজয়েটে (Sporozoite) পরিণত হয়। স্পোরোজয়েটগুলো এরপর সিস্ট প্রাচীর ভেঙ্গে মশকীর হিমোসিলে মুক্ত হয়। একটি উওসিস্টে প্রায় দশ হাজার স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। স্পোরোজয়েটগুলো হিমোসিল থেকে মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকে। একটি মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রায় ৩,২৬,০০০ স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। রক্তপিপাসু মশকী

কোনো মানুষের রক্ত পান করলে জীবাণুগুলোর শতকরা ১০% লালারসের সাথে মানবদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। মশকীর লালাগ্রন্থিতে স্পোরোজয়েটগুলো প্রায় ২ মাস অবস্থান করে।

## ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে জনুক্রম ব্যাখ্যা

কোনো জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম (alternation of generation) বলে। ম্যালেরিয়া জীবাণু একটি অন্তঃপরজীবী প্রোটোজোয়া প্রাণী। এদের জীবন চক্রে জনুক্রম ঘটে।

**হ্যাপ্লয়েড (n) দশা :**

**স্পোরোজয়েট দশা (n) :** মশকীর দেহে স্পোরোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্পোরোজয়েট দশা (n)। এই স্পোরোজয়েটবাহী মশকী মানুষকে দংশন করার সময় লালা নিঃসরণ করে। এ লালা এন্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করে, জায়গাটিকে অবশ ও পিচ্ছিল করে। আর এ লালার সাথে জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

**মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n) :** স্পোরোজয়েট (n) মানুষের যকৃতকে আক্রমণ করে সেখানে হেপাটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। হেপাটিক সাইজোগনির ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n)। মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রোগ্যামিটোসাইট (n) ও ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট (n)।

**ডিপ্লয়েড (2n) দশা :**

**জাইগোট দশা (2n) :** মশকীর দেহে গ্যামিটোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্ত্রী গ্যামিট ও পুং গ্যামিট। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট (2n) সৃষ্টি হয়।

**উওকিনেট (2n) :** জাইগোট রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে উওকিনেট (2n)। পরে উওকিনেট উওসিস্ট (2n)-এ পরিণত হয়। ডিপ্লয়েড (2n) উওসিস্ট মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোরোজয়েট সৃষ্টি করে। এ হ্যাপ্লয়েড স্পোরোজয়েট দশা মশকীর লালার মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।

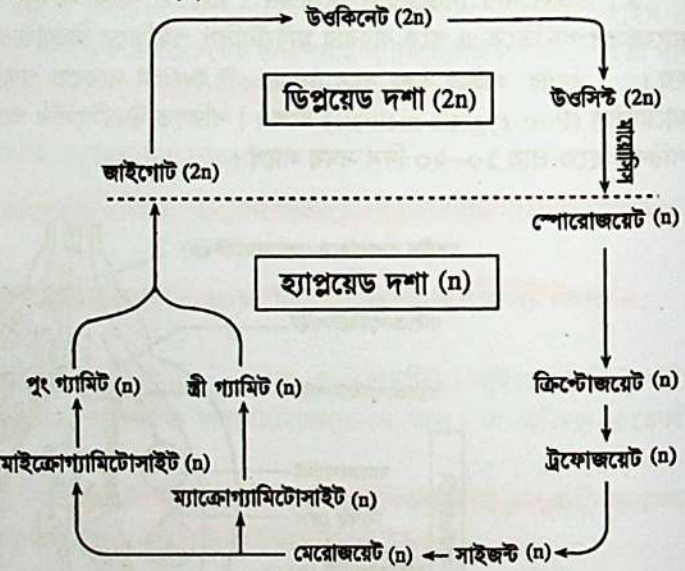


চিত্র ৪.১৮ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে জনুক্রমের রেখচিত্র।

**জনুক্রমের তাৎপর্য (Significance of Alternation of Generation)**

১। জনুক্রমে জীবাণুর প্রজাতির ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখে।

২। জনুক্রম জীবাণুর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

৩। জনুক্রম জীবাণুর বিস্তৃতিতে সহায়তা করে।

৪। জনুক্রম জীবাণুর জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে।

৫। জনুক্রম প্রজাতিতে বৈচিত্র্য আনে ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

**ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন ও যৌন চক্রের মধ্যে পার্থক্য**

| পার্থক্যের বিষয় | অযৌন চক্র (সাইজোগনি) | যৌন চক্র (স্পোরোগনি) |
|---|---|---|
| ১. পোষকের যে স্থানে ঘটে | মানুষের যকৃত ও লোহিত কণিকায়। | মশকীর ক্রপের মধ্যে এবং হিমোসিলে। |
| ২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ | মেরোজয়েট, ট্রফোজয়েট, সাইজন্ট, সিগনেট রিং ও রোজেট এ চক্রের মধ্যবর্তী ধাপ। | এ চক্রে গ্যামিট, জাইগোট, উওকিনেট, উওসিস্ট ও স্পোরোজয়েট দেখা যায়। |
| ৩. সর্বশেষ ধাপ | গ্যামিটোসাইট। | স্পোরোজয়েট। |
| ৪. হিমোজয়েন | এ চক্রের শেষের দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়। | কখনোই হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় না। |
| ৫. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া | কাঁপুনিসহ জ্বর, সে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ। | তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। |
| ৬. চক্রের পুনরাবৃত্তি | ঘটে। | ঘটে না। |
| ৭. গ্যামিট | সৃষ্টি হয় না। | সৃষ্টি হয়। |
| ৮. জাইগোট | যেহেতু গ্যামিট সৃষ্টি হয় না তাই জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। | পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ঘটিয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে। |

**ম্যালেরিয়া জীবাণুর সুপ্তাবস্থাকাল বা সুপ্তিকাল (Incubation period)**

কোনো পোষক দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশের সময় থেকে সেই পোষকের দেহে উক্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে রোগের সুপ্তাবস্থাকাল বলে। যেমন : ম্যালেরিয়া জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করার সাথে সাথে মানবদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করার কয়েকদিন পর মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করার সময় থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে ম্যালেরিয়া রোগের **সুপ্তাবস্থাকাল** (Latent period or Incubation period) বা **সুপ্তিকাল** বলে। কোনো রোগের জন্য সুপ্তিকাল সাধারণভাবে নির্দিষ্ট।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির সুপ্তাবস্থার সময়কাল :

(i) *Plasmodium vivax* ১২–২০ দিন
(ii) *Plasmodium falciparum* ৮–১৫ দিন
(iii) *Plasmodium ovale* ১১–১৬ দিন
(iv) *Plasmodium malariae* ১৮–৪০ দিন

**ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ :** ম্যালেরিয়া জ্বর-এর লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

(i) প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

(ii) দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর ১০৫°–১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর কমে যায়। ৪৮ ঘণ্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসাই *Plasmodium. vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ।

(iii) তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত রক্তের লোহিত কণিকা ভাঙতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, প্লীহা, যকৃত ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

## ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ (Transmission of Malaria)

স্ত্রী *Anopheles* মশকীই ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটানোর একমাত্র মাধ্যম। পৃথিবীতে প্রায় দু'শত প্রজাতির *Anopheles* মশকী থাকলেও মূলত: ৬টি প্রজাতিই এ রোগের ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটায় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। প্রজাতিগুলো হলো- *Anopheles culicifacies, A. stephensi, A. fluviatilis, A. dirus, A. sundaicus, A. minimus*। মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশের পর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে একসময় গ্যামিটোসাইট গঠন করে। *Plasmodium vivax* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো মানুষের রক্তে ৭ দিন, কিন্তু *Plasmodium falciparum* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো ৩০- ৬০ দিন, এমনকি ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ হতে এরা মশকীর দেহে প্রবেশের সুযোগ পেলে পরবর্তী চক্র সম্পন্ন করতে শুরু করে। মশকীর প্রতিবার দংশনে *Plasmodium vivax* এর অন্তত: ৬টি, এবং *Plasmodium. falciparum* এর অন্তত: ১২টি গ্যামিটোসাইট মশকীর দেহে প্রবেশ করে। রক্তপান করার সময় মশকীর দেহে বিভিন্ন দশার জীবাণু প্রবেশ করলেও একমাত্র গ্যামিটোসাইটগুলো বেঁচে থাকে, অন্যান্য দশায় জীবাণুগুলো মশকীর এনজাইমের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। গ্যামিটোসাইটগুলো গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি

ধাপের মাধ্যমে অবশেষে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এ মশকী কোনো মানুষকে দংশন করলে মানুষ এ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। এভাবে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে এবং ম্যালেরিয়া জন-জনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

## ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention & Control of Malaria)

ম্যালেরিয়া যেহেতু মশকী বাহিত একটি রোগ তাই মশকী প্রতিরোধের মাধ্যমে এ রোগ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব। ম্যালেরিয়া প্রতিকার তিনভাবে হতে পারে; যথা- (ক) মশকী নিধন, (খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা এবং (গ) চিকিৎসা।

**(ক) মশকী নিধন :** মশককুলের বংশ পরিবেশ হতে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়-

**(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস :** মশকীরা বদ্ধ পচা পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশের পরিত্যক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

**(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা :** পচা পানিতে ডিম ফুটে মশকীর লার্ভা ও পিউপা দশা সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে এরা অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এছাড়া বিএইচসি (BHC), ডায়েলড্রিন (dieldrin) ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। পানিতে জুভেনাইল হরমোন ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর রূপান্তর ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

উপরোক্ত সবগুলো পদ্ধতিই কমবেশি পানি তথা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। তাই যে সকল জলাশয়ে লার্ভা বা পিউপা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঐ সকল জলাশয়ে গাপ্পি, কই, শিং, খলসে, তেলাপিয়া, পুঁটি, টাকি ইত্যাদি জাতীয় লার্ভিভোরাস মাছ চাষ করলে এরা মশকীর লার্ভা ও পিউপাগুলোকে ভক্ষণ করে। এতে মশকী নিধনের পাশাপাশি পরিবেশও থাকে দূষণমুক্ত।

**(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন :** ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে মশকীকুলকে ধ্বংস করা যায়।

(iv) অধিকাংশ শহর এলাকাতে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

**(খ) মশকীর দংশনের হাত হতে আত্মরক্ষা :** ঘরের দরজা-জানালায় মাশকীরোধী ঘন তারের নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আত্মরক্ষা করা যায়। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা যায়। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার এবং সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়া প্রয়োগ করা।

**(গ) ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা (Treatment) :** ম্যালেরিয়া রোগীকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা আবশ্যক। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ওষুধ। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি হয়েছে। যেমন-ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্লোর, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

> বি. দ্র. সুস্থদেহে সিনকোণা রস কম্পজ্বর সৃষ্টি করে। কম্প জ্বরে (ম্যালেরিয়া) সিনকোণা রস সেবনে রোগ আরোগ্য হয়। এ থেকে হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে।

**ম্যালেরিয়ার টিকা (Malarial Vaccine) :** দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTS,S নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA)

ইতোমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন ও PATH Malaria নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় এ যুগান্তকারী আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছে। চার ডোজের এ টিকা *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের শিশুরা এ পরজীবী কর্তৃক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং এতে এদের মৃত্যুর হারও বেশি। তবে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার প্রভৃতি সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের দেশগুলো এ রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে পরিগণিত।

**দলগত কাজ :** ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রটি অঙ্কন করে ক্লাসে উপস্থাপন কর।

## সার-সংক্ষেপ

**ভাইরাস :** ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু। এরা জীবকোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে, আবার জীবকোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় জড় বস্তুর অবস্থায় বিরাজ করে। ভাইরাস দণ্ডাকার, গোলাকার, ঘনক্ষেত্রাকার, ব্যাঙাচি আকার বা ডিম্বাকার হতে পারে। TMV ভাইরাস দণ্ডাকার, HIV ভইরাস গোলাকার, $T_2$ ভাইরাস ব্যাঙাচি আকার। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড RNA যেমন- TMV, মানুষের পোলিও ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA যেমন- $T_2$ ভাইরাস, TIV, এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি। উদ্ভিদ, প্রাণী (মানুষসহ), পশুপাখির বহু রোগের কারণ ভাইরাস। HIV দিয়ে মানুষে AIDS রোগ, ফ্ল্যাভি-ভাইরাস দিয়ে ডেঙ্গুজ্বর, র‍্যাবিস ভাইরাস দিয়ে জলাতঙ্ক, ভেরিওলা ভাইরাস দিয়ে গুটিবসন্ত রোগ হয়।

**$T_2$-ফায :** $T_2$ ব্যাকটেরিওফায সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। মাথা ও লেজ নামক দুটি অংশ নিয়ে $T_2$-ফায-এর দেহ গঠিত। এর নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বিসূত্রক DNA যা ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে বলে এদের নাম হয়েছে ব্যাকটেরিওফায।

**ব্যাকটেরিয়া :** এক বচনে ব্যাকটেরিয়াম। এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক এবং আদিকোষী। এরা দলবেঁধে থাকতে পারে, তবে এককোষী। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া। মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে এদের আবাসস্থল। এদের দেহে ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, তবে জড় কোষ প্রাচীর আছে। ব্যাকটেরিয়া বহু রোগের কারণ, যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, প্রতিষেধক টিকা। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে, দুধ থেকে দই তৈরি, পনির তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

**কক্কাস :** গোলাকার ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় কক্কাস। একা একা থাকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস, জোড়ায় জোড়ায় থাকে ডিপ্লোকক্কাস, চেইনের মতো থাকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস।

**দ্বি-ভাজন :** দ্বি-ভাজন কোষ বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষের নিউক্লিয়ার বস্তু এবং সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন। এটি একটি অযৌন জনন প্রক্রিয়া।

**মেরোজাইগোট :** স্ত্রী এবং পুং জনন কোষের যৌন মিলনের ফলে যে কোষের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় জাইগোট। জাইগোটে স্ত্রী ও পুং জনন কোষের পূর্ণাঙ্গ অংশ মিলিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দাতা কোষের (পুং জনন কোষ) আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে (স্ত্রী জনন কোষ) প্রবেশ করে, তাই গ্রহীতা কোষ দাতা কোষের পূর্ণ বংশগতীয় বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহণের মাধ্যমে যে জাইগোট তৈরি হয় তাকে বলা হয় মেরোজাইগোট। এটি যৌন জনন প্রক্রিয়া, তবে এতে কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।